বেঙ্গল টাইমস
২ মে, ২০২৫

সত্যজিৎ স্পেশ্যাল

ISSN 2445 5657
bengaltimes.in

সূচিপত্র

ভাগ্যিস তিনি শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন
❑ দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ
❑ কুণাল দাশগুপ্ত

হাইলি সাসপিসিয়াস
❑ ময়ূখ নস্কর

ওই গানগুলো না গাইলে কে চিনত!
❑ রঞ্জন সেন

হেমন্ত, শ্যামল, মান্না দূরেই থেকে গেলেন
❑ অনির্বাণ ঠাকুর

সত্যজিৎ রায়কে খোলা চিঠি
❑ অন্তরা চৌধুরি

যেজন ছিলেন নির্জনে
❑ সংহিতা বারুই

আমার আবদারেই সোনার কেল্লা
❑ সংহিতা বারুই

মুকুলের ছায়া থেকে নিস্তার নেই কুশলের
❑ স্বরূপ গোস্বামী

মহারাজা, তোমারে সেলাম
❑ সত্রাজিৎ চ্যাটার্জি

নন্দনের সেই বিকেল
❑ রাতুল ভট্টাচার্য

মিঠুন, অমিতাভের বৃত্তেই হয়ত আটকে যেতাম
❑ অম্বরীশ হালদার

গল্প

ভূতের রাজা দিল বর
❑ স্বরূপ গোস্বামী

ISSN 2445 5657

bengaltimes.in

বেঙ্গল টাইমস প্রকাশন। সম্পাদকীয় কার্যালয়: কেবি ১২, সেক্টর ৩, সল্টলেক, কলকাতা ১০৬। ফোন ৯৮৩১২২৭২০১। আইএসএসএন ২৪৪৫ ৫৬৫৭
ই মেল: bengaltimes.in@gmail.com, ওয়েবসাইট: bengaltimes.in

সম্পাদক: স্বরূপ গোস্বামী

সম্পাদকীয়

নিঃশব্দেই পেরিয়ে যায়

দিনটা কিছুটা যেন নিঃশব্দেই আসে। আবার নিঃশব্দে পেরিয়েও যায়। আসলে, পয়লা মে এলেই বাঙালি ছুটির আমেজে চলে যায়। পরের দিন, অর্থাৎ ২ মে খবরের কাগজ থাকে না। ফলে, সত্যজিৎ রায়ের জন্মদিনটা আর খেয়ালই থাকে না।

পরপর দু’দিন বাংলার দুই কিংবদন্তির জন্মদিন। একদিন মান্না দের, পরের দিন সত্যজিৎ রায়ের। দু’জনেই শতবর্ষ পেরিয়ে এসেছেন। আসলে, মে মাসের শুরুর সময়টাই বড় অদ্ভুত। কখনও বিধানসভা, কখনও পঞ্চায়েত, কখনও লোকসভা— ভোটের আবহ যেন লেগেই থাকে। বাঙালির ভোট চর্চা পেলে আর কী চাই! তখন কে মান্না দে, আর কেই বা সত্যজিৎ রায়!

এবার যদিও ভোট নেই। ভোট নেই তো কী হল, যুদ্ধ আছে! কয়েকদিন ধরে টিভি খুললেই যেন একটা যুদ্ধ-যুদ্ধ আবহ। এই বুঝি ভারত যুদ্ধে নেমে পড়ল। কানফাটানো চিৎকার। নিজের ব্যর্থতা আড়াল করতে শাসকের একটাই অস্ত্র, যুদ্ধের জিগির তোলো। ‘দেশপ্রেম’ এর বন্যা বইয়ে দাও। সেই ট্রাডিশন এখনও চলছে। কেন্দ্রের আছে যুদ্ধজিগির, আর রাজ্যের আছে ‘জয় জগন্নাথ’। মোদ্দা কথা, নজর ঘুরিয়ে দাও, ভুলিয়ে দাও।

আচ্ছা, সত্যজিৎ রায় যুদ্ধ সম্পর্কে ঠিক কী ভাবতেন? একটা গানের লাইনেই তাঁর মনোভাব স্পষ্ট করেছিলেন, ‘তোরা যুদ্ধ করে করবি কী তা বল!’ কিন্তু হল্লারাজাকে এই প্রশ্নটা কে আর করে! প্রশ্ন করলেই আরপনি দেশদ্রোহী। রাজ্য চুলোয় যাক, সুশাসন চুলোয় যাক, ‘হল্লা চলেছে যুদ্ধে।’

এই কারণেই সত্যজিৎ রায়কে স্মরণ করা যেন আরও জরুরি। সেই কতকাল আগে তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন। আমরা বুঝিনি। বোঝার চেষ্টাই করিনি। আমরা ফেসবুকে তাঁর একটা ছবি সাঁটিয়ে দিয়েই দায় শেষ করি। বড়জোর হোয়াটসঅ্যাপের প্রোফাইল ছবিটা একটু বদলে ফেলি। তাঁর একটা গানের দৃশ্য দিয়ে তাঁকে ধন্য করি।

কিংবদন্তি পরিচালককে কীভাবেই বা স্মরণ করতে পারি! বেশি কিছু করার দরকার নেই। তাঁর ছবি তো আর খুব দুষ্প্রাপ্য নয়। অন্তত ইউটিউব থেকে একটা ছবি দেখা যায়। হয়তো আগে দেখা, তবু না হয় আবার দেখলেন। তাঁর অনেক ছোট গল্প, উপন্যাস অডিও বুক হয়ে ঘুরে বেড়ায়। বই পড়ায় যদি সত্যিই অ্যালার্জি থেকে থাকে, না হয় একটা বা দুটো অডিও বুক শুনলেন। ফোনের দিকে তাকিয়ে কত সময়ই তো নষ্ট হয়। না হয় একদিন সেটা সত্যজিৎ চর্চায় লাগালেন।

আর যদি মনে হয়, একদিন কেন, মাঝে মাঝেই তো তাঁকে স্মরণ করা যেতে পারে, মাঝে মাঝেই তো তাঁর ছবি দেখা যেতে পারে, তাহলে তো আর কথাই নেই। স্বয়ং সত্যজিৎ ধন্য হবেন। স্বর্গ থেকে নেমে এসে বলবেন, ‘বাস কর পাগলা, রুলায়গা ক্যা!’

শিখলেন ছবি আঁকা। লিখলেন গল্প। ছবি তৈরির ভাবনাও সেখানেই। সত্যজিৎ রায়ের জীবনের অন্য এক অধ্যায়ের কথা লিখলেন দেবাশিস মুখার্জি।

ভাগ্যিস তিনি শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন!

একটা সিদ্ধান্ত জীবনকে কীভাবে বদলে দেয়! সত্যজিৎ রায়ের জীবনে টার্নিং পয়েন্ট কোনটা? একটা জায়গার নামই বলতে হয়, তা হল শান্তিনিকেতন। সত্যজিৎ কত বড় পরিচালক, কত বড় সাহিত্যিক, কত বড় শিল্পী, এসব নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। অথচ, এইসব আলোচনায় অদ্ভুৎভাবে ব্রাত্য থেকে যায় শান্তিনিকেতন। ফুটনোটের মতো কোথাও কোথাও দেখি, শান্তিনিকেতনে পড়া শেষ না করে মাঝপথেই ফিরে আসেন। বড়ই সরলীকরণ। আসলে, জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল ওই শান্তিনিকেতন।

কিন্তু সত্যজিৎ হঠাৎ শান্তিনিকেতনে গেলেন কেন? এর পেছনেও একটা ইতিহাস রয়ে গেছে। তা হল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্ল্যানচেট। প্ল্যানচেটে একদিন সুকুমার রায়কে ডাকলেন রবীন্দ্রনাথ। একথা সেকথার পর সুকুমার রায় নাকি প্ল্যানচেটে বলেছিলেন, আমার ছেলেকে তোমার কাছে ডেকে নাও। আর তাই রবীন্দ্রনাথ সুপ্রভাদেবীকে (সত্যজিতের মা) বললেন, তোমার ছেলেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

প্রশ্ন উঠতে পারে, রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ সুকুমারকেই বা প্ল্যানচেটে ডাকতে গেলেন কেন? উপেন্দ্রকিশোর

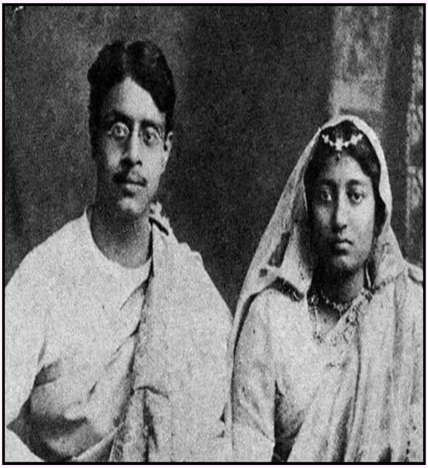

আর রবীন্দ্রনাথ প্রায় সমসাময়িক। কিন্তু উপেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে তাঁর সেভাবে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়নি। তার চেয়ে অনেক বেশি বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল সুকুমারের সঙ্গে। তাও আবার এদেশে নয়, বিদেশে। ১৯১১-১২ নাগাদ সুকুমার রায় পড়াশোনার জন্য গিয়েছিলেন লন্ডনে। রবীন্দ্রনাথও তখন গীতাঞ্জলির ইংরাজি অনুবাদ নিয়ে যান লন্ডনে। সেই সময় সুকুমার নিজে রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু কবিতা ইংরাজিতে অনুবাদ করেন। শুধু তাই নয়, ব্রিটিশদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় করিয়ে দেন সুকুমার রায়। সুকুমার বয়সে ছোট হলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে বন্ধুর মতোই

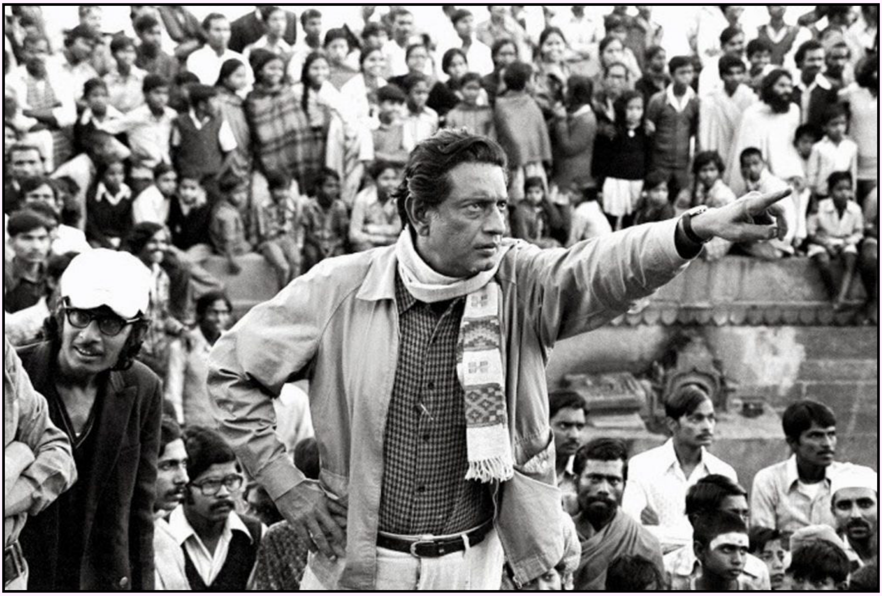

মিশতেন। সেই বন্ধুত্ব এতটাই গাঢ় হয়ে ওঠে যে, রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে কলকাতায় এসেছিলেন শুধুমাত্র সুকুমারের বিয়েতে হাজির থাকবেন বলে। বন্ধুত্বের পাশাপাশি একটা কৃতজ্ঞতাও বোধ হয় থেকে গিয়েছিল। তাই সুকুমার খুব অল্প বয়সে মারা গেলে, তাঁর পরিবার নিয়ে বেশ উদ্বিগ্নই ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই কারণেই প্ল্যানচেটে সুকুমারকে ডাকা। আর সুকুমারের আর্জি শুনে সত্যজিতকে ডেকে পাঠানো।

এদিকে, সত্যজিৎ তখন প্রেসিডেন্সিতে ইকনমিক্স নিয়ে পড়ছেন। ইকনমিক্স কেন? খুব ভালবাসতেন? না। আসলে, সুকুমার যখন মারা যান, তখন সত্যজিতের বয়স মাত্র আড়াই বছর। মামাবাড়িতে কষ্ট করেই বেড়ে উঠেছেন। ইকনমিক্স নিয়ে পড়ার একটাই কারণ, পাশ করলে দ্রুত চাকরি পাওয়া যাবে। শান্তিনিকেতনে যাওয়ার ব্যাপারে সত্যজিতের তেমন ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু মায়ের ইচ্ছে, তাই যেতে হয়েছিল। সেটা ১৯৪০ সাল। তখনও রবীন্দ্রনাথ বেঁচে। এই শান্তিনিকেতনে আসার পরই জীবন আমূল বদলে গেল সত্যজিতের। তার আগে আমরা যে সত্যজিতের পরিচয় পাই, তিনি ইংরাজি বই পড়তেন, পাশ্চাত্যের মিউজিক শুনতেন। বিদেশি আর্টের কিছু খোঁজ রাখলেও ভারতীয় শিল্পকলা সম্পর্কে একেবারেই স্বচ্ছ ধারনা ছিল না। তাঁর সবকিছুই তখন ইংরাজিকে ঘিরে। শুনলে অবাক হবেন, শান্তিনিকেতনে আসার আগে সত্যজিৎ ভাল করে বাংলা পড়তেও জানতেন না। সিগনেট প্রেসের দিলীপ কুমার গুপ্ত একবার সত্যজিৎকে একটি বাংলা বই উপহার দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি লিখেছিলেন, 'বাংলা সাহিত্যে শূন্যজ্ঞানী মানিককে'। এই ছিল তাঁর বাংলা জানার পরিধি। কিন্তু সেই সত্যজিতের আমূল রূপান্তর ঘটে গেল শান্তিনিকেতনে এসে। শিক্ষক হিসেবে পেলেন নন্দলাল, বিনোদবিহারীকে। ভারতীয় শিল্পকলা কী, তার অন্তর্নিহিত রূপ কী, তা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করলেন। বন্ধু হিসেবে পেলেন পৃথ্বীশ নিয়োগী, দীনকর কৌশিককে। ঘুরে এলেন অজন্তা, ইলোরা, খাজুরাহো। দেখার চোখটাই যেন বদলে গেল সত্যজিতের। দুচোখ ভরে দেখলেন প্রকৃতিকে।

শুধু কি তাই? শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরিতে পেলেন তিনটি ইংরাজি বই। তার আগে পর্যন্ত

হলিউডের ছবি সম্পর্কে অন্যরকম ধারনা ছিল। এই বই তিনটিই সব ভাবনাকে এলোমেলো করে দিয়ে গেল। বুঝলেন, নায়ক বা নায়িকা নয়, পরিচালকই আসল। ছবি নিয়ে বোধটা সেখান থেকেই তৈরি হয়। এবার সাহিত্যের কথায় আসি।

শান্তিনিকেতনে এসেই তিনি দুটো গল্প লেখেন। দুটোই ইংরাজিতে। দুটোই শিল্প সংক্রান্ত। একটার নাম সেডস অফ দ্য গ্রে, আরেকটার নাম অ্যাবস্ট্রাকশন। দুটোই বেরিয়েছিল অমৃতবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয়তে। সেই প্রথম তাঁর গল্প লেখা। অর্থাৎ, গল্প লেখার সূচনাটাও কিন্তু শান্তিনিকেতনেই। আরও একটা ছোট্ট ঘটনার কথা বলা যাক। অ্যালেক্স অ্যারেনসন নামের এক অধ্যাপক ছিলেন। তিনি খুব ভাল পিয়ানো বাজাতেন। উত্তরায়নে রবীন্দ্রনাথের যে পিয়ানো, সেটাই বাজাতেন অ্যারেনসন। সত্যজিৎ প্রায়ই সেখানে যেতেন। মন দিয়ে পিয়ানো বাজানো শুনতেন। এমনকি নোটেশানের পাতাও উল্টে দিতেন। সঙ্গীতের ব্যাপারেও অন্য এক চেতনা তৈরি হল।

ফিরে এসে কাজ নিলেন বিজ্ঞাপন সংস্থায়। ততদিনে ছবির হাতটাও অনেক পরিণত। তবু ছবি আঁকা ছেড়ে বেছে নিলেন ফিল্মের দুনিয়াকে। সত্যজিৎ নিজেই বলেছেন, 'যে দেশে নন্দলাল, বিনোদবিহারী আছেন, সে দেশে হাজার চেষ্টা করলেও তাঁদের থেকে ভাল ছবি আঁকতে পারব না। তাঁরাই ছবির শেষ কথা।' তাঁর মনে হয়েছিল, আমাদের ফিল্মটাই কাঁচা। যদি কিছু করতে পারি, এখানেই করতে হবে। তাই বেছে নিলেন পথের পাঁচালী। তারপর তো ইতিহাস। শ্যাম বেনেগাল বলেছিলেন, 'এই প্রথম একজন ভারতীয় চিত্র পরিচালক ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ছবি তৈরি করলেন।' যে মানুষটা গ্রামবাংলা জানতেন না, যে মানুষটা বাংলা পড়তেই জানতেন না, তিনি প্রকৃতিকে এভাবে মেলে ধরলেন! এই দেখার চোখটাই তৈরি হয়েছিল শান্তিনিকতনে।

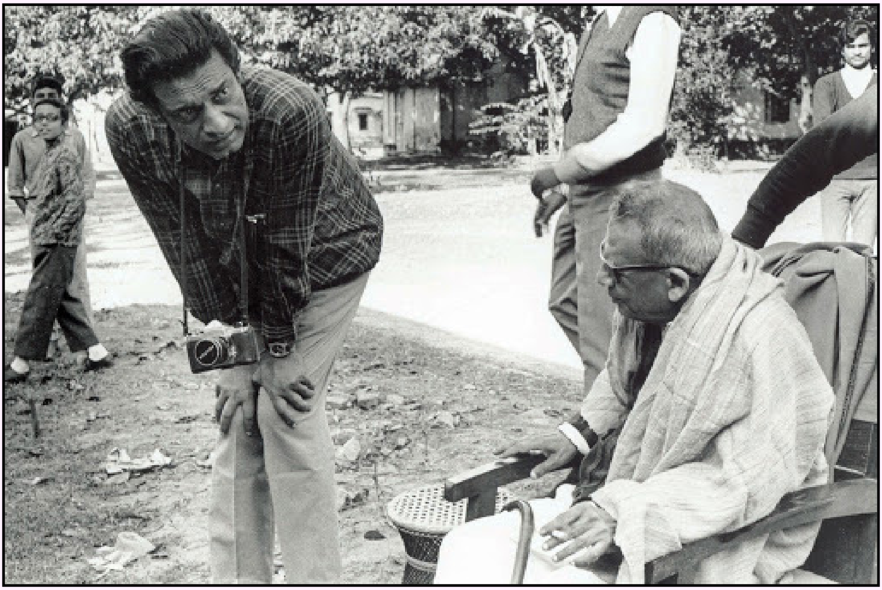

হাইলি সাসপিসিয়াস

ময়ূখ নস্কর

আমাকে কেউ সিরিয়াসলি নেয় না মশাই! কেউ সিরিয়াসলি নেয় না!

মানছি, আমি আক্ষরিক অর্থেই একজন কাগুজে মানুষ। বইয়ের পাতার বাইরে আমার কোনও অস্তিত্বই নেই। হ্যাঁ, সিনেমা বা টিভির পর্দায় আমাকে দেখা গেছে ঠিকই, কিন্তু বইয়ের কাগজই হল আমার জন্মভুমি এবং কর্মভূমি! কিন্তু এমন চরিত্র তো কতই আছে। গোরা, অপু, অমল, শ্রীকান্ত। এদের তো কেউ সামান্য সাহিত্যিক চরিত্র বলে হেলাফেলা করে না? এদের সৃষ্টি কেন হল? এদের মাধ্যমে স্রষ্টা কী বার্তা দিতে চাইলেন, এরা কি আসলে স্রষ্টারই প্রতিরূপ, ইত্যাদি নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে দিস্তা দিস্তা কাগজ খরচা হয়। তাহলে মশাই আমার বেলায় এত কার্পণ্য কেন? এই যে ফেলুদা আর প্রফেসর শঙ্কু? এঁরা যে সত্যজিৎ রায়েরই চরিত্রের দুটো দিক, তা তো সবাই জেনে গেল। তাহলে আমি কার চরিত্রের কোন দিক, সেটা কেউ জানল না কেন? কেন কেউ ভাবে না আমাকে সত্যজিৎ রায় সৃষ্টি করলেন কেন?

ফেলুদার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা যোধপুর যাবার পথে ট্রেনে। আমাকে দেখেই তপেশের ‘যাকে বলে পেট থেকে ভসভসিয়ে সোডার মতো হাসি গলা অবধি’ উঠে এসেছিল। কেউ ভাবল না, এত উপমা থাকতে হাসির সঙ্গে সোডার উপমা কেন এল? ভাবুন।
তারপরে ভাবুন, সোনার কেল্লায় জানা গেল, আমি ভদ্রেশ্বরে থাকি। কিন্তু পরের থেকেই

আমার বাড়ি হয়ে গেল কলকাতার গড়পারে। কেন? ভদ্রেশ্বরের ভুল তিনি শুধরে নিলেন কেন? এত জায়গা থাকতে গড়পারেই বা কেন? গড়পারে আমি ছাড়া আর কার বাড়ি ছিল? ভাবুন।

এবার সিনেমাটার কথা ভাবুন। আমি ফেলু-বাবুর শরীরের মাপ জানতে চাইছি। উত্তরে ফেলুবাবু বললেন, তাঁর ছাতি, কোমর সবই ছাব্বিশ ইঞ্চি। আমি অট্টহাস্য করে বললাম, 'আপনি কি শুয়োর?'

আরও ভাবুন, মন্দার বোসকে হাতেনাতে ধরে ফেলার পর ফেলুবাবু বললেন, 'আপনার কী

শাস্তি হবে জানেন তো? তিন মাস জেল আর সাতদিনের ফাঁসি।'

সোনার কেল্লা থেকে বেরিয়ে আসুন। এবার জয় বাবা ফেলুনাথ। কাশীর আধো অন্ধকার থমথমে গলিতে হাঁটছি আমি, ফেলুবাবু আর তপসে। ফেলুবাবু কবিতা আওড়াচ্ছেন, "অলি গলি চলি রাম...।" আমি বললাম, এই পুরানো বাড়িগুলো haunted, কড়িকাঠ থেকে বাদুড় ঝুলছে। বাদুড় শুনে ফেলুবাবু বললেন, 'বাদুড় বলে ওরে ও ভাই শজারু, আজ রাতে দেখবে একটা মজারু।' চরম টানটান মুহূর্ত, একটু পরেই একটা খুন হবে। এমন সিরিয়াস জায়গায় এমন হাস্যরস আর কেউ কখনও সৃষ্টি করেছেন কি?

করেছিলেন। অকালমৃত্যুর আগে জীবনের শেষ কবিতায় এক বাঙালি কবি লিখেছিলেন—

আজকে দাদা যাওয়ার আগে
বলব যা মোর চিত্তে লাগে
নাই বা তাহার অর্থ হোক
নাই বা বুঝুক বেবাক লোক
....
আলোয় ঢাকা অন্ধকার,
ঘন্টা বাজে গন্ধে তার।
হ্যাঙলা হাতি চ্যাংদোলা
শুন্যে তাদের ঠ্যাং তোলা।
....
আদিম কালের চাদিম হিম,
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম।
ঘনিয়ে এলো ঘুমের ঘোর
গানের পালা সাঙ্গ মোর।
....

সেই কবিরও বাড়ি ছিল গড়পারে। 'সোডার মতো হাসি,' 'আপনি কি শুয়োর?' 'তিন মাস জেল আর সাতদিনের ফাঁসি,' 'অলি গলি চলি রাম...,' 'বাদুড় বলে ওরে ও ভাই শজারু...', এসব আসলে তাঁরই সৃষ্টি।w

শৈশবে হারিয়ে ফেলা সেই মানুষটিকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্যই কি সত্যজিৎ আমাকে সৃষ্টি করেছিলেন? যে কারণে তাঁর ছড়ার বইয়ের নাম 'তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম,' গল্পের নাম 'প্রফেসর হিজিবিজবিজ' সেই একই কারণেই কি আমার মতো একটি চরিত্র সৃষ্টি করা? ফেলুবাবু আর শঙ্কুর কথা তো অনেক হল, আমার সৃষ্টি নিয়ে বিশেষজ্ঞরা একটু ভাবুন না।

বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ

কুণাল দাশগুপ্ত

সেটাও ছিল এক অর্থে ‘শিল্প বিপ্লব’। ব্রিটিশ ভূখণ্ড নয়, শিল্পের এই প্রবল ঝাঁকুনির কেন্দ্রস্থল কলকাতা।

সময়টা ছয়ের দশকের মাঝামাঝি। ১৯৬৪ সাল। রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড়কে সেলুলয়েডে বন্দি করলেন সত্যজিৎ রায়। নাম দেওয়া হল চারুলতা। ছবিতে রবি ঠাকুরের আমি চিনি গো চিনি তোমারে গানটিকে ব্যবহার করবেন বলে মনস্থির করলেন রায় সাহেব। গানটি হবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের লিপে। কিন্তু গাইবেন কে?

সেই সময়টাতে রবি ঠাকুরের সৃষ্টির ওপর একচ্ছত্র অধিকার ছিল বিশ্বভারতীর। পান থেকে সংস্কারের চুন খসাবে, এমন সাধ্যি কার! বিশ্বভারতীর এই লাগাতার দখলদারির হাত থেকে রেহাই পাননি দেবব্রত বিশ্বাসও। শান্তিনিকেতন মধ্যযুগের ক্যাথলিক চার্চের মতোই আচরণ করত। পৃথিবী স্থির, সূর্য প্রদক্ষিণ করে তাকে, এই মত যেমন অবিনশ্বর, রবি ঠাকুরের গানে কী কী করতে হবে বা হবে না, এক শান্তিনিকেতনী ফতোয়াও অলঙ্ঘনীয় ছিল সে যুগে। অনুশাসনের বাড়াবাড়ি দেখে কার্ল মার্কস একবার বলে বসেছিলেন, থ্যাঙ্ক গড, আই অ্যাম নট দ্য মার্কসিস্ট।

স্বাধীনোত্তর সময়ে বিশ্বভারতীর ছুঁৎমার্গ এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছিল, স্বয়ং রবি ঠাকুরও

হয়ত বিরক্ত হয়ে বলতেন, রক্ষে করো। আমার আর রাবীন্দ্রিক হয়ে কাজ নেই।

সত্যজিৎ রায় বিদ্রোহ করে ফেলেছিলেন। তিনি চাইছিলেন একটা নতুন গলা। এমন এক স্বর যা কিনা বোলপুরের বোলচাল থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র। শান্তিনিকেতনী শাসন থেকে বহু বহু দূরে অবস্থিত। ডাক পড়ল কিশোর কুমারের। কিন্তু কেন কিশোর কুমার? রুমা গুহঠাকুরতার সূত্রে শুধু নয়, কিশোর কণ্ঠকে এমনিতেই পছন্দ করতেন সত্যজিৎ। ব্যক্তিগত সম্পর্কও ছিল অত্যন্ত মধুর। তিনি চেয়েছিলেন তরুণ সৌমিত্রর ঠোঁটে ঝকঝকে কিশোরের আওয়াজকে বসিয়ে দিতে। সেক্ষেত্রে তিনি একশো শতাংশ সফল। কিশোর কুমার সত্যজিৎ রায়কে অনুরোধ করেন গানের রেকর্ডিংটা বম্বেতে করতে। রাজি হয়ে যান তিনি। কিশোর কুমারের রেকর্ড করা গানের ওপর পিয়ানোর আস্তরণ বসিয়েছিলেন স্বয়ং সত্যজিৎ। আর কিশোর কুমার কোনও পারিশ্রমিক ছাড়াই করেছিলেন ‘আমি চিনি গো চিনি তোমারে।’ ওই

গানটাই যেন ছবিটার ট্রেড মার্ক হয়ে উঠেছে।
সত্যজিৎ আর কিশোর কুমারের মধ্যেকার সম্পর্কের রসায়নটা গবেষণার বিষয় হতে পারে। শোনা যায়, পথের পাঁচালী ছবির জন্য কিশোর কুমার নাকি আর্থিক সাহায্য করেছিলেন তাঁর মানিক-মামাকে। সত্যজিৎ রায় কিশোরের হিন্দি গানের গুণমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন। তাঁর পছন্দের কিশোর কুমারের গাওয়া বেশ কিছু গানের উল্লেখ তিনি করেছেন বিভিন্ন আলাপ আলোচনায়। কিশোর কুমারের স্টেজ শোতেও মাঝে মাঝে হাজির থাকতেন তিনি। এখনও ইউটিউবে দেখা যাবে, কিশোর গাইছেন, দর্শকাসনে রাজ কাপুর, লতা মঙ্গেশকরদের পাশাপাশি সত্যজিৎ রায়ও বসে আছেন।

চারুলতার পর গুপী গাইন বাঘা বাইন ছবিতে গুপীর চরিত্রে কিশোর কুমারের কথাই ভেবেছিলেন সত্যজিৎ। এমনকী ওই বিখ্যাত গানগুলোও নাকি কিশোরকে দিয়েই গাওয়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ব্যস্ত কিশোর কুমার তখন সময় দিতে পারেননি। ফের দীর্ঘ বছর পর ঘরে বাইরে ছবিতে আবার ডাক পড়ে কিশোর কুমারের। এইখানেও সেই সৌমিত্র। এবং এই ক্ষেত্রেও কোনওরকম বাজনা ছাড়া খালি গলায় কিশোর গাইলেন বিধি বাঁধন কাটবে তুমি, বুঝতে নারি নারী কী চায়, চল রে চল সবে ভারত সন্তান। এবং যথারীতি ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যায় সেই সৃষ্টি।

এক সান্ধ্য আড্ডায় রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ প্রয়াত পার্থ বসু এই লেখককে বলেছিলেন, ‘সঘন গহন রাত্রি’ গানটা সবার গলায় শুনো। তাহলে বুঝবে, যে স্বরগুলো দীর্ঘদিন স্বরলিপিতে আটকে ছিল, কেমন করে তা কিশোর–কণ্ঠে ধরা দিল।’

সত্যজিৎ–কিশোর কুমারের যুগলবন্দি রবি ঠাকুরকে ঘিরে শক্তপোক্ত শর্তাবলীর প্রাচীরকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের উঠোন হয়েছিল সর্বজনীন। সত্যি কথা বলতে কী, সেদিনের সেই শিল্প বিপ্লব না হলে হয়ত চেনাই যেত না ‘আমি চিনি গো চিনি তোমারে’কে।

হেমন্ত, শ্যামল, মান্না দূরেই থেকে গেলেন

অনির্বাণ ঠাকুর

সত্যজিৎ রায়ের প্রথম ছবি 'পথের পাঁচালী' মুক্তি পায় ১৯৫৫ নাগাদ। শেষ ছবি 'আগন্তুক' ১৯৯১ সালে। অর্থাৎ, ছবির জীবন মোটামুটি ৩৬ বছরের। এই সময়ে বাংলা গানের জগতে কারা দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন? কয়েকটা নাম বলা যাক, শ্যামল মিত্র, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে। আর মেয়েদের মধ্যে গীতা দত্ত, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়। আর মুম্বইয়ের শিল্পী ধরলে লতা মঙ্গেশকার বা আশা ভোঁসলে। আচ্ছা, এঁরা কেউ কি সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে গান গেয়েছেন? বা, প্রশ্নটা একটু উল্টেও করা যায়, এঁদের কাউকে কি সত্যজিৎ রায় নেপথ্য শিল্পী হিসেবে ব্যবহার করেছেন?

আচ্ছা, সত্যজিৎ রায়ের প্রথম ছবির সঙ্গীত পরিচালক কে? একটু ভাবুন। ঠিক ধরেছেন, পণ্ডিত রবিশঙ্কর। তাহলেই ভেবে দেখুন, তখন সত্যজিৎ রায় সেই অর্থে কেউ নন। একটি ছবিও করেননি। তখন তিনি সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে বেছে নিলেন রবিশঙ্করকে। এবার আসুন জলসাঘর ছবির কথায়। সেখানেও সঙ্গীত পরিচালক কিংবদন্তি বাহাদুর খাঁ। কিন্তু আর কোনও ছবিতে কি তেমনভাবে সঙ্গীত পরিচালক বা সুরকারের দরকার হয়েছে? সলিল চৌধুরি, সুধীন দাশগুপ্ত, এস ডি বর্মণ বা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়দের কখনও সুর দেওয়ার জন্য ডাকলেন না কেন? তখন গান লিখতেন কারা? গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরি, মুকুল দত্ত, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব রায়ের মতো গীতিকাররা। আচ্ছা, এঁদেরও কাউকে সত্যজিতের ছবিতে গান লিখতে দেখা গেল না কেন?

সত্যজিতের ছবির গান বললেই সবার আগে মনে পড়বে গুপী গাইন বাঘা বাইন আর হীরক রাজার দেশের কথা। সেখানে বেশ কয়েকটি গান আছে। প্রায় সবই গেয়েছেন অনুপ ঘোষাল। কতই রঙ্গ

দেখি দুনিয়ায় গেয়েছেন লোকশিল্পী অমর পাল। খালি গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত রয়েছে চারুলতা, ঘরে বাইরেতে। সেখানে গেয়েছেন কিশোর কুমার। অর্থাৎ, কিশোর ছাড়া কোনও তারকা শিল্পীকে তাঁর দরকার হয়নি। তাও অন্য কোনও মৌলিক গানে নয়, নিছকই রবি ঠাকুরের গানে।

যিনি প্রথম ছবিতে পণ্ডিত রবিশঙ্করকে দিয়ে সুর করালেন, তিনি চাইলে পরের দিকে যাকে খুশি, তাঁকে দিয়েই সুর করাতে পারতেন। সত্যজিতের ছবিতে সুর করতে পারলে বা গান গাইতে পারলে শিল্পীরাই ধন্য হয়ে যেতেন। ছবির স্টার ইমেজ আরও খানিকটা বেড়ে যেত। কিন্তু সত্যজিৎ সেই হাতছানিতে সাড়া দিলেন না কেন? একটাই কারণ, ফোকাস। ছবির বিষয়েই ফোকাস করতে চেয়েছেন। ছবিকে ছাপিয়ে গান নিয়ে চর্চা হোক, বা গান ছবির বিষয়কে ছাপিয়ে যাক, এমনটা চাননি। তাই অধিকাংশ ছবিতেই গানকে অনুষঙ্গ করেননি। ছবি হিট করানোর জন্য বা একটা আইটেম বাড়ানোর জন্য গানের শরণাপন্ন হতে হয়নি। পরের দিকের সব ছবিতে তিনি নিজেই সুরকার। সব নেপথ্য সঙ্গীতই তাঁর নিজের।

ছবি থেকে বেরিয়ে এসে এই শিক্ষা যদি জীবনে প্রয়োগ করেন! আমরা একটা কাজ করতে যাই। কিন্তু নানা চোরা গলিতে হারিয়ে যাই। বলতে চাই একটা কথা। কিন্তু শেষমেশ দাঁড়িয়ে যায় অন্য কথা। কখনও কাহিনি হারিয়ে যায় উপকাহিনির ভীড়ে। কখনও নজর টেনে নেয় গান। ছবির বদলে গানের চর্চাই প্রধান হয়ে ওঠে। লেখার বদলে বিন্যাসই যেন বড় হয়ে ওঠে। সত্যজিৎ রায় নিজে একজন দুরন্ত ইলাস্ট্রেশন শিল্পী হওয়া সত্ত্বেও বুঝতেন, কনটেন্টই আসল। যেখানে কনটেন্টে জোর দিতে হবে, সেখানে অন্যান্য অনুষঙ্গ কমিয়ে আনতে হবে। ছবির ক্ষেত্রে সেটাই প্রয়োগ করেছেন। দর্শককে বিষয়ের দিকে, ভাবনার গভীরতার দিকেই ঠেলে দিয়েছেন। বিনোদনের নামে অযথা গানকে বা নাচকে আমদানি করতে হয়নি।

ওই গানগুলো না গাইলে কে চিনত!

রঞ্জন সেন

জীবনে কত গান গেয়েছেন ? নিজেও মনে করতে পারবেন না। কিন্তু অনুপ ঘোষাল বলতেই বাঙালির কোন গান মনে পড়ে? প্রায় ৫০ বছর আগে গাওয়া গুপির গলার গান। সেই গানের জন্যই বেঁচে থাকবেন অনুপ ঘোষাল। তারপর হীরক রাজার দেশে, গুপিবাঘা ফিরে এল। তিনটি ছবি মিলিয়ে মোট ৩২ টি গান।

সুযোগটা এসেছিল অদ্ভুতভাবে। রেডিও তে শিশুমহলে গাইতেন অনুপ। তাঁর মা আর আর সত্যজিৎ-পত্নী বিজয়া রায় দুই বন্ধু। সেই সুবাদে অনুপের অনুষ্ঠান শোনা হত রায় পরিবারে। একদিন সত্যজিৎ হঠাৎ করে বিজয়ার কাছে জানতে চাইলেন, 'তোমার সেই বন্ধুর ছেলে তো বেশ ভাল গাইত। এখন আর গায় না?' ডাক পড়ল অনুপের। গুপি গায়েন বাঘা বায়েনের সব গানই গাওয়ানো হল ১৯ বছরের ওই শিল্পীকে দিয়ে।

সব ঘটনাই পরিষ্কার মনে আছে অনুপের, 'প্রতিটা গান কিন্তু উনি নি্জে গেয়ে শোনাতেন। তখন তো টেপ রেকর্ডার ছিল না। শুনেই মুখস্থ রাখতে হত। তবে উনি খুব সহজ করে বুঝিয়ে দিতেন।' ওই গানের পর চারপাশের চেনা জগৎটাই বদলে গিয়েছিল নবীন গায়কের, 'ওই গান গুলোই যেন আলাদা পরিচিতি এনে দিল। তারপর হীরক রাজার দেশেতেও গাওয়ার সুযোগ পেলাম। ওই ছবির গানগুলোও জনপ্রিয় হয়েছিল।'

সেই ছোটবেলায় আকাশবাণীতে সুযোগ পেয়েছিলেন নজরুল গীতির শিল্পী হিসেবে। নজরুলের গানের জন্যই তিনি ডক্টরেট। কিন্তু আমজনতার কাছে নজরুল গীতির চেয়েও যেন বেশি প্রিয় হয়ে আছেন গুপির গলার গানের জন্য। এখনও যেখানে যান, গুপি-বাঘার গানের অনুরোধ আসবেই। অনুপের কথায়, 'ওই গানগুলোই তো আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে । অনেক গান গেয়েছি, এটা ঘটনা। কিন্তু ওই গানগুলো না গাইলে কে আমাকে চিনত !

সত্যজিৎ রায়কে খোলা চিঠি

আগে দেখা। পরে পড়া। ফলে, পড়তে গিয়ে দেখা ছবিটাই ভিড় করে। যেমন জটায়ুর কথা পড়তে গিয়ে মনে পড়ে সন্তোষ দত্তর কথা, সমাপ্তি পড়তে গিয়ে ভেসে ওঠে অপর্ণা সেনের মুখ। অস্তিত্ব আর অভ্যাসের সঙ্গে এভাবেই জড়িয়ে আছেন সত্যজিৎ রায়। তাঁর জন্মদিনে তাঁকে মুগ্ধতা মাখানো খোলা চিঠি। লিখলেন

অন্তরা চৌধুরি।

শ্রীচরণেষু সত্যজিৎবাবু

শুনেছিলাম আপনি রোজ সকালে উঠে চিঠি লেখেন। তাই মনে হল আপনার জন্মদিনে আপনাকেও আমি একটা চিঠি লিখি। চিঠির থেকে ভাল উপহার তো আর কিছু হয় না। বর্তমান ফেসবুক আর হোয়াটস অ্যাপের যুগে হাতে লেখা চিঠি তো প্রায় উঠেই গেছে।

আপনার সম্পর্কে অনেক ভারী ভারী কথা বলার মানুষ আছে। আপনাকে নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছে এমন লোকেরও অভাব নেই। আপনার শিল্প নৈপুণ্যের প্রশংসা করার অনেক গুণগ্রাহী আছেন। আমি তাঁদের সম্পর্কে প্রচণ্ড শ্রদ্ধাশীল। তাঁরা আপনার মতো মানুষ সম্পর্কে কত কিছু জানেন। অথচ আমি তেমন কিছুই জানি না। তবে আপনি আমায় স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছেন। কল্পনার জাল বুনে তার ভেতর হারিয়ে যেতে শিখিয়েছেন।

ছোটবেলায় রূপকথার গল্প পড়েছিলাম। মনে দাগ কাটেনি। কিন্তু যখন 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' দেখলাম তখন আমার বয়স ছয় কি সাত। ওই বয়সেও বুঝতে এতটুকুও অসুবিধে হয়নি। আবার যখন 'হীরক রাজার দেশে' দেখলাম, তখন সে কি আনন্দ। 'গুপী বাঘা ফিরে এল' যে আপনার ছবি নয়, সেটা বোঝার মতো বয়স তখনও আমার হয়নি। তখন গুপী–বাঘা মানেই আপনি। একদিকে রোমাঞ্চ, আবার একদিকে ভয়ও। সন্ধ্যে বেলায় একা একা বাইরে বেরোতাম না। ভাবতাম, যদি বাঁশবনের ওই ভূতের রাজা বেরিয়ে আসে!

গ্রীষ্মকালের রাত্তিরে খোলা আকাশের নীচে ঠাকুমার পাশে শুয়ে শুয়ে ভাবতাম আচ্ছা, ভূতের রাজা যদি আমাকে বর দিতে চায়, তাহলে আমি কী কী চাইব? কত এলোমেলো ভাবনা আসত মাথায়। শিশুমন তখন সত্যি মিথ্যে বুঝত না। সে

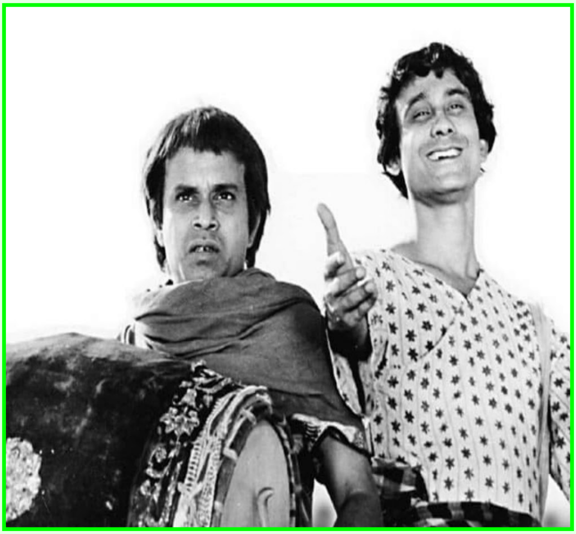

টিভি ছিল। সেখানেই দেখেছিলাম 'পোস্টমাস্টার' সিনেমাটা। খুব যে বুঝেছিলাম এমন দাবি করব না। কারণ তখনও পর্যন্ত গল্পটা পড়া হয়নি। আর গল্পটা না পড়লে বোধহয় রতনের ওই অব্যক্ত যন্ত্রণাকে বোঝা যাবে না। কিন্তু রতনের মুখ আর পোস্টমাস্টারের জায়গায় অনিল চ্যাটার্জির মুখটা মনে ছিল। পরে যখন পড়েছি, চরিত্রের মুখগুলো আর নতুন করে আঁকতে হয়নি। সেই ছেলেবেলায় সেই ছবি আঁকা হয়ে গিয়েছিল।

নিজেই কল্পনার জাল বুনত। কতবার যে মনে মনে গুপী বাঘার কাছে যেতে চেয়েছি। বড় হয়ে জানতে পারলাম, ওই ভূতের রাজাটা নাকি আপনি ছিলেন! এখনও বিশ্বাস হয় না জানেন।

তারপর সেই ছোট্ট মুকুলের 'সোনার কেল্লা'। কত ছোট বয়সে দেখেছি। কিন্তু প্রথম দেখার সেই অনুভূতি, সেই শিহরণ এখনও মনে আছে। সেইসময় কোনও একটা ম্যাগাজিনে জাতিস্মর নিয়ে একটা আর্টিকেল বেরিয়েছিল। 'সোনার কেল্লা' দেখার পর একই সঙ্গে রোমাঞ্চ ও ভয় কাজ করত। ভয়টা কেন বলতে পারব না। মুকুল না হয় সামনে থেকে সোনার কেল্লা দেখেছে। কিন্তু আমরাও কোথায় যেন ছোট্ট মুকুলের চোখ দিয়েই সোনার কেল্লা দেখেছিলাম। ওই সিনেমাটা দেখার পর থেকে এখনও মনের মধ্যে রাজস্থান যাওয়ার স্বপ্ন লালন করি। বড় হতে হতে কতবার সিনেমাটা দেখেছি। কিন্তু আজও পুরনো হয়নি।

'হীরক রাজার দেশে'র কথাগুলোতো আজও প্রবাদ হিসেবে ব্যবহার করি-

'অনাহারে নাহি খেদ
বেশি খেলে বাড়ে মেদ'।

তখন আমাদের বাড়িতে সাদাকালো ছোট্ট একটা

তবে একটা সিনেমা ভীষণভাবে দাগ কেটেছিল মনে। সেটা হল 'পথের পাঁচালী'। যদিও সিনেমাটার তত্ত্বের দিক কিছুই সেই বয়সে বুঝিনি। কিন্তু দুর্গা আর অপু কোথায় যেন নিজের জীবনের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। সিনেমাটা টি ভি তে যখন প্রথম দেখি, তখন আমার ভাইও অপুর বয়সী। কেন জানি না, নিজেকে দুর্গার মতো মনে হত। তখনকার জীবন এখনকার মত এত স্বাচ্ছন্দ্যে ভরা ছিল না। আমি আর ভাই প্রকৃতির কাছে কতবার যে ছুটে চলে গেছি নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কারের নেশায়। বাড়িতে তেমন কোনও বাধা ছিল না কোথাও যাওয়ার ব্যাপারে। আমি আর ভাই দুজনেই তখন দুজনের পরম বন্ধু। যদিও আমার ভাই আমার থেকে দশ বছরের ছোট। ও যখন স্কুলে যেত, তখন ঠিক দুর্গার মতো পরিপাটি করে চুল আঁচড়ে ভাত খাইয়ে দিতাম। টিনের বাক্স, আসন নিয়ে লাস্ট আমি স্কুল গেছি, মাটিতে বসেছি। কিন্তু ভাই যখন স্কুলে যায় তখন সেই প্যাঁটরা বাক্স হেরিটেজের আখ্যা পেয়েছে। বড় বেলায় 'পথের পাঁচালী' পড়েছি আর কেঁদেছি। ভারী ভারী চশমা পরে আলাদা দুটো শিল্প মাধ্যমের আলোচনা করেছি। একইভাবে 'সমাপ্তি', 'জয় বাবা ফেলুনাথ', 'চারুলতা' আগে দেখেছি। পরে বড়বেলায় পড়েছি। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল সিনেমাগুলো আগে দেখার ফলে বইয়ে যখন পড়ি

তখন চরিত্রের মুখ হিসেবে সেই নায়ক বা নায়িকার মুখটাই ভেসে ওঠে। জটায়ু পড়তে গিয়ে যেমনভাবে ভেসে উঠত সন্তোষ দত্তর মুখ, ঠিক তেমনি ‘সমাপ্তি’ পড়তে গিয়ে মৃন্ময়ীর চরিত্রে বারবার অপর্ণা সেনের মুখটাই ভেসে ওঠে। আর অপূর্বর জায়গায় সৌমিত্র। ছোটবেলায় না বুঝেই সিনেমাগুলো দেখেছি-লাম বলে মনে গেঁথে গিয়েছিল। পড়তে পড়তে মনের ভেতর দৃশ্যটা উপভোগ করতাম। দাদার কাছে শুনেছিলাম, সত্যজিৎ রায়ের গল্পে যে জায়গার প্লট থাকে সেই জায়গাটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য তিনি নাকি সেই স্পটে গিয়েই শুটিং করেন। অনেকটা সেই কারণেও আপনার সিনেমা দে-খতাম।সশরীরে না যেতে পারি, অন্তত আপনার হাত ধরে তো অনেক জায়গা ঘুরে আসা যাবে। ছোটদের কাছেই শুধু নয়, আপামর বাঙালির কাছেও ফেলুদা বড় প্রিয়। শুধু ছোটবেলায় নয়, কিশোরী বেলাতেও চারপাশে কোনও সমস্যা হলে ভাবতাম, এসব পুলিশের কম্ম নয়। এখানে একবার ফেলু মিত্তিরকে আনতে পারলেই কেল্লা ফতে। কিন্তু এই সুপ্ত ইচ্ছেটা কাউকে বলতেই পারতাম না। আর কেউ ফেলু মিত্তিরকে ডাকার কথা বলছে না দেখে খুব রাগ হত। পরে বুঝলাম ফেলু মিত্তির আছে আমাদের কল্পনায়, আমাদে ভালবাসায়।

এখন জীবনের জটিলতায় যখনই হাঁপিয়ে যাই তখনই ফেলুদার দ্বারস্থ হই। ‘আগন্তুক’ যতবারই টিভিতে দেয়, ততবারই দেখি। এক একটা বয়সে এক একরকম জীবন পাঠের দীক্ষা দেয় এই সিনেমাগুলো। জানেন, ইউটিউবে কতবার ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’ খুঁজেছি। কিন্তু পাইনি। আরও অনেক কিছুই পাই না। কিছুদিন আগে দার্জিলিং গিয়েছিলাম। আমার কর্তা আমাকে আপনার এবং আরও অনেক গুণী মানুষের স্মৃতি বিজড়িত কেভেণ্টার্স এ নিয়ে গিয়েছিল। ওখানে বসে চিকেন সসেজ খেতে খেতে ভাবছিলাম এখানে ওই কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে তাকিয়ে আপনিও একসময় খেতেন। ওই ছাদ থেকেই নাকি শুটিং হয়েছিল। কত গল্পে রয়ে গেছে কেভেন্টার্স! কী অদ্ভুত শিহরণ যে হচ্ছিল! ছোটবেলা থেকে আপনার সিনেমা দেখে বড় হয়ে উঠেছি বলে নিজের রুচিকে এখনও বিকৃত হতে দিতে পারিনি। পারি না, হলে যা সিনেমা চলে তাই দেখতে। হতে পারে এটা আমার অক্ষমতা। চিঠিটা যে দীর্ঘ হয়ে গেল এ নিয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার মতো আরও অনেকের জীবনের প্রতি পরতে যে আপনি জড়িয়ে আছেন একথা না বললেই নয়। লকডাউন না থাকলে হয়ত আপনার শতবর্ষকে ঘিরে কত উৎসব হত। এরকম নিঃশব্দে কি আপনার জন্মদিন পেরিয়ে যেত! আবার পরক্ষণেই মনে হচ্ছে, একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে। এত উৎসব, এত আড়ম্বর হয়ত আপনারও ভাল লাগত না। এত হোর্ডিং দেখলে আপনিও হয়ত লজ্জায় মুখ লুকোতেন। যে স্মরণ করার, নিঃশব্দে, নিজের বাড়িতেই করুক। চাইলেই আপনার সিনেমা ইউটিউবে দেখা যায়। দেখুক, আগে দেখে থাকলে, আবার দেখুক। আপনার শততম জন্মদিনে এই চিঠিটুকুই আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য।

যেজন ছিলেন নির্জনে

কোনও স্ক্রিপ্ট বা গল্প লিখলে সবার আগে পড়ে শোনাতেন স্ত্রী বিজয়া রায়কে। পথের পাঁচালীর আগে নিজের গয়না তুলে দিয়েছিলেন সত্যজিতের হাতে। বিশপ লেফ্রয় রোডের বাড়িতে গিয়ে এমন অনেক অজানা কথা জেনে এলেন সংহিতা বারুই।

বিজয়া দাস বড় হয়েছেন পাটনায়, পড়াশোনা শুরু করেন কনভেন্ট স্কুলে। বাবা চারুচন্দ্র দাস ছিলেন ব্যারিস্টার। মা ছিলেন গৃহবধূ মাধুরী দেবী। চার কন্যার মধ্যে তিনি ছিলেন ছোট। মাত্র তেরো বছর বয়সে পিতৃহারা হয়ে মায়ের হাত ধরে চলে আসেন কলকাতায় তাঁর নিকট আত্মীয়ের বাড়ি। ঠিক সেই মুহূর্তে পারিবারিক ব্যবসা বিক্রি করে পিতৃহারা ছোট্ট সত্যজিৎ রায় তাঁর মা সুপ্রভা দেবীর সঙ্গে চলে আসেন মামাবাড়িতে। এক সঙ্গে ছোট থেকে বড় হওয়া ভাল–লাগা, খারাপ লাগা মিলেমিশে একাকার। সত্যজিৎ রায় ও বিজয়া দাস। ক্রমে দুজনের মধ্যে বাড়তে থাকে ঘনিষ্টতা। দুজনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েন ।

প্রথমে সম্পর্কের টানা পোড়েনে রেজিস্ট্রি বিয়ে। দূর সম্পর্কের বোন হয়ে গেলেন সত্যজিৎ এর ঘরণী বিজয়া রায়। বেশ কিছুদিন টানাপোড়েনের পর মা সুপ্রভাদেবী ঘরে তুললেন পুত্রবধূ বিজয়া রায়কে। কলকাতায় এসে সামাজিক অনুষ্ঠান করা হয়। সেই দিনের কথা মৃত্যুর আগেও মনে ছিল বিজয়া দেবীর। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছিলেন সেদিনের বেশ কিছু অজানা কথা। যেমন সদ্য বউ হয়ে এসে শাশুড়ি মা সুপ্রভাদেবীকে জিঞ্জেস করেছিলেন কী বলে ডাকব? উত্তরে সেদিন সুপ্রভাদেবী বলেছিলেন, ‘এবার শুধু মা বলেই ডাকবি।’

সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে বিজয়া রায়ের বৈবাহিক

সম্পর্ক সে সময়ের সমাজ খুব আন্তরিকতার সঙ্গে মেনে নেয়নি। প্রায়ই নানা কটূক্তি শুনতে হত এই যুগল দম্পতিকে। আড়ালে আরও কত কী বলা হত, কে জানে! পরবর্তী জীবনে বিজয়া রায় শুধুমাত্র সত্যজিৎ ঘরণী ছিলেন তা নয়, তিনি সত্যজিৎ রায়ের কর্মজীবনের সঙ্গেও নিজেকে জড়িয়ে ছিলেন ওতপ্রোতভাবে। কলকাতায় এসে বেথুন কলেজ থেকে স্নাতক হয়েছিলেন। বিজয়া দেবীর সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহ ছিল। গানের গলাও ছিল বেশ মিষ্টি। তাই তাঁর বাবা চারুচন্দ্র দাস জীবিত কালে চেয়েছিলেন মেয়েকে প্যারিস পাঠিয়ে পশ্চিমী ধ্রুপদী সংগীতের তালিম দিতে। কিন্তু সে আশা আর পূরণ হয়নি। তবে গ্র্যাজুয়েশনের পর প্রথম দিকে বিজয়া দেবী যোগদান করেন সরকারি সংস্থার কেরানি পদে। পরে সেই চাকরি ছেড়ে চলে যান বম্বের সিনেমা জগতে। শুরু করেন অভিনয়। ১৯৪৪ সালে শেষরক্ষা সিনেমায় অভিনয়ের পাশাপাশি নেপথ্য গায়িকাও ছিলেন।

পাশ্চাত্য সঙ্গীত ও চলচ্চিত্র, এই দুটি বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন সত্যজিৎ রায়ও। এই আগ্রহ থেকেই সত্যজিৎ ও বিজয়া দেবীর মধ্যে বাড়তে থাকে ঘনিষ্ঠতা। পরবর্তী কালে এই বিজয়া রায়ই নাকি সত্যজিৎ রায়কে বুঝিয়েছিলেন পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সঙ্গীতের মধুরতা। বিবাহিত জীবনে সত্যজিৎ রায়ের সমস্ত কাজেই বিজয়া রায় ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়। ছবির স্ক্রিপ্ট পড়া থেকে শুরু করে, পোশাক ঠিক করা, সব ক্ষেত্রেই। এমনকী অভিনেতা – অভিনেত্রী স্থির করার ক্ষেত্রেও বিজয়া রায়ের কোনও না কোনও ভূমিকা থাকতই। এককথায় বলা যেতে পারে, বিজয়া রায় ছাড়া সত্যজিতের জীবন কখনও পূর্ণতা পায়নি। উদাহরণ স্বরূপ অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় 'পথের পাঁচালী'র কথা। সেখানে অর্থাভাবে যখন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ছবির শুটিং, তখন বিজয়া স্বামীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন তাঁর সমস্ত গয়না। তিনি ও জানতেন, এই গয়নায় পুরো ছবির শুটিং সম্ভব নয়। তবুও তাঁর এই অবদান কি ভোলা যায়! শুধু তাই নয়, সত্য-জিৎ রায় যেমন বিজয়া রায়কেই শোনাতেন তাঁর স্ক্রিপ্ট, তেমনি পরবর্তী কালে সাহিত্যচর্চা শুরু করার সময়ও লেখা শেষ হলে প্রথমেই সেটি শুনিয়ে নিতেন তাঁকে। তাঁর মতামতকে খুব গুরুত্বও দিতেন সত্যজিৎ রায়।

সন্দীপ রায়ের কথায় আরও জানা গেল, 'বাবা যখন ফেলুদা লিখেছেন, মা তখনও তাঁকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। আসলে মা ডিটেকটিভ গল্প পড়তে খুব ভালবাসতেন। হয়তো সেই ভালো–লাগা থেকেই ফেলুদা লেখার কথা মাথায় আসে বাবার। শুধু তাই নয়, বাবা গল্প-গুলো ছাপার আগে অবশ্যই দেখিয়ে নিতেন মাকে। কোথাও যদি অসংলগ্ন লাগত, মা সঙ্গে সঙ্গে জানাতেন, বাবাও দেরি করতেন না, সেগুলি ঠিক করে নিতেন।' কথা গুলো বলতে বলতে কোথায় যেন হারিয়ে গেলেন সন্দীপ। আসলে, সত্যজিতের আড়ালে থাকা সেই বিজয়া যে সবার আড়ালেই চলে গিয়েছেন। থেকেও গেছেন। লেখায়, প্রেরণায়, স্মৃতিতে।

আমার আবদারেই হয়েছিল সোনার কেল্লা

বাইরে থেকে যতটা গম্ভীর মনে হত, মানুষটা মোটেই তেমন ছিলেন না। খুব মজা করতেন। সেন্স অফ হিউমার ছিল অসাধারণ। টুকরো টুকরো নানা স্মৃতি উঠে এল পুত্র সন্দীপ রায়ের কথায়। শুনে এলেন সংহিতা বারুই।

বাবাকে দেখে সকলেরই একটা ভুল ধারণা ছিল, সত্যজিৎ রায় খুব গুরু-গম্ভীর মানুষ। কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন খুবই রসিক। কাজের ফাঁকে হাসি ঠাট্টা করতে ছাড়তেন না। একটা ব্যক্তিত্ব ছিল, এটা ঘটনা। ওটা বাইরের আবরণ। ভেতরের মানুষটা একেবারেই অন্যরকম। যাঁরা একটু হলেও তাঁর সঙ্গে মিশেছেন, তাঁরা সেই অন্য মানুষটার খোঁজ পেয়েছেন।

একটা মজার কথা আপনাদের বলি – ১৯৬১ সালে বাবা নতুন করে শুরু করলেন 'সন্দেশ' পত্রিকা। প্রথমেই তিনি লিখলেন 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু' তারপর লিখলেন শঙ্কু। তারপর যখন ১৯৬৫ সালে 'ফেলুদা' লিখলেন, তখন লক্ষ্য করলেন ছবি করে তিনি যা চিঠি পাচ্ছেন, তার থেকে বেশি চিঠি পাচ্ছেন গল্প লিখে। বিশেষ করে ছোটদের গল্প। এই সময় আমার বয়স ১২ বা ১৩ বছর। একদিন আমিও বাবাকে আবদার করে বসি – তুমি তো শুধু বড়দের জন্যই ছবি করছ, ছোটদের জন্যও একটা ছবি কর না। তিনিও শুনলেন আমার কথা। তৈরি হল সোনার কেল্লা। তারপর জয়বাবা ফেলুনাথ। ইচ্ছে ছিল আরও ফেলুদা বানানোর। কিন্তু সন্তোষ দত্ত চলে গেলেন। বাবা বললেন, জটায়ুই নেই, কার জন্য করব।

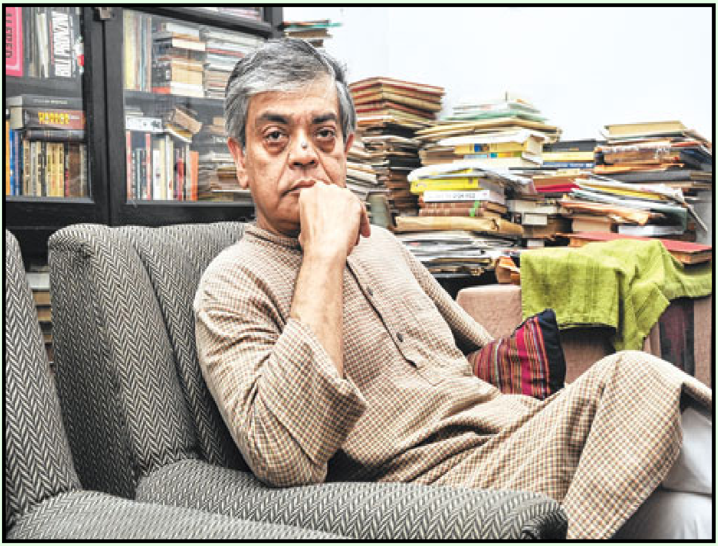

বাবার কথা বলতে হলে অনেক কথাই বলতে হয়। কিন্তু এত কথা কী করে বলব! বাবা ছিলেন আর পাঁচজন মানুষের মতোই। যদিও সংসারী মোটেই ছিলেন না। সংসারের বিষয়টা সবই সামলাতেন আমার মা। তবে পরিবারের নানা বিষয়ের প্রতি তাঁর নজর ছিল। তিনি ছিলেন খুবই ঘরোয়া। কাজের চাপে পরিবারের জন্য খুব একটা সময় দিতে পারতেন না। যেখানে শুটিংয়ে যেতেন, সেখানে আমাদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। আমি পড়াশোনা করতাম বলে সাধারণত আমার ছুটির সময় দেখেই শুটিংয়ের সময় রাখতেন।

আমার কাছে তিনি শুধুমাত্র আমার বাবা ছিলেন না, আমার গুরুও ছিলেন। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি, আমার পোস্ট প্রোডাকশনের প্রতি ঝোঁক ছিল বেশি। তাই সেদিকেই আমি বেশি থাকতাম। আমার অভ্যাস ছিল প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তোলা। কিন্তু তাতে কেউ কখনও বিরক্ত হয়নি। তাঁরাও আমাকে খুব সহযোগিতা করেছেন। যাই হোক, বাবা রসিক মানুষ ছিলেন ঠিকই, তবে খাদ্যরসিক বলা যায় না। তাঁকে যা দেওয়া হত, তিনি তাই খেতেন। নিজে থেকে কোনও দিন কোনও পছন্দের খাবার খেতে চাননি। এছাড়া খাবার টেবিলে গল্প করতে করতে খেলেও খাবারটা খেয়ে নিতেন খুব তাড়াতাড়ি। তবে নলেন গুড়, মিষ্টি দই আর ইলিশ মাছের প্রতি অবশ্য বাবার একটা টান ছিল।

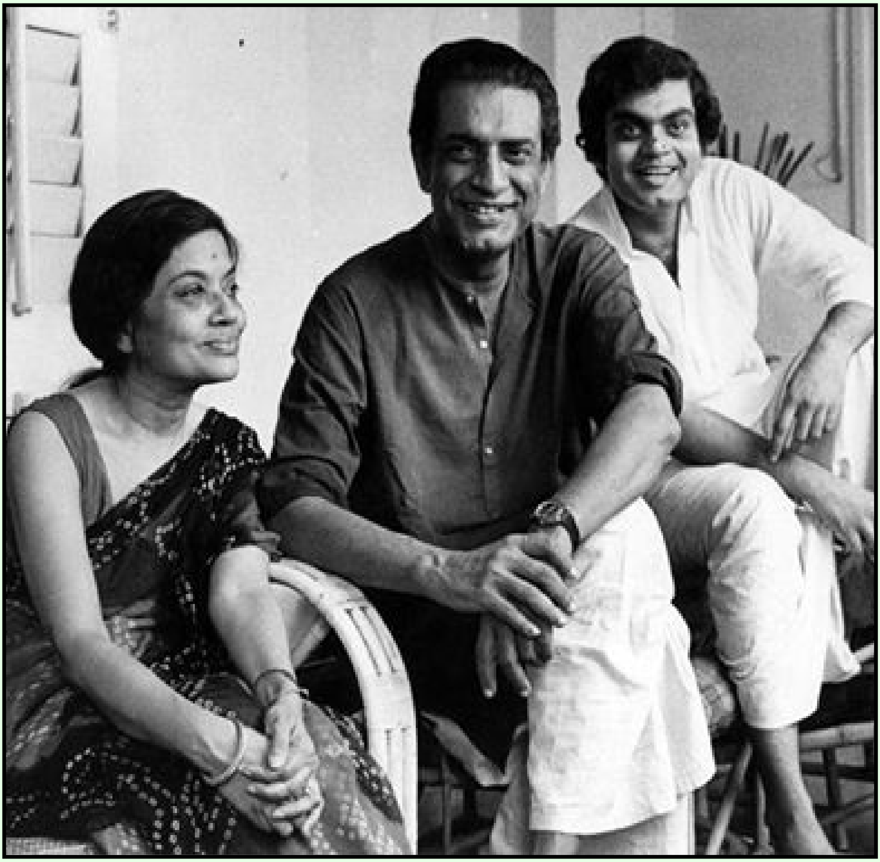

মহারাজা, তোমারে সেলাম

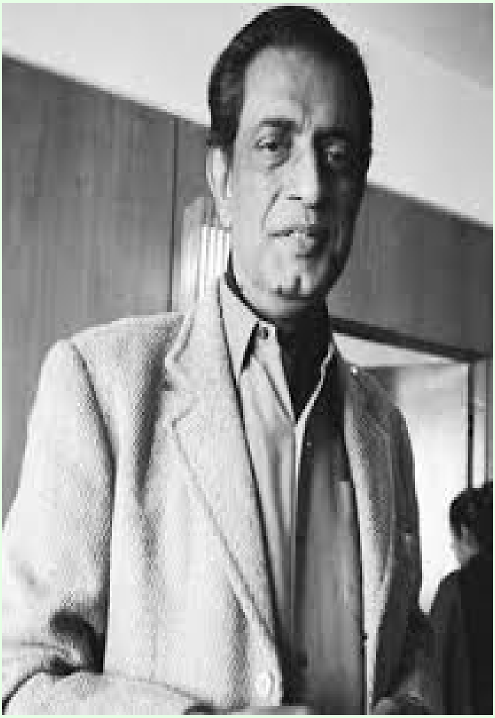

সত্রাজিৎ চ্যাটার্জি

বেশ মনে পড়ছে, ৯ বছর বয়সে টিভিতে সোনার কেল্লা দেখার পর ফেলুদার স্টাইলে একবার বাড়ির বড়দের এনে রাখা সিগারেট ঠোঁটে ছুঁইয়েছিলাম। তখন তো সিনেমা মানে সোনার কেল্লা, জয় বাবা ফেলুনাথ আর গুপী গাইন বাঘা বাইন ও হীরক রাজার দেশে এইটুকুই জ্ঞানগম্যি ছিল। ফেলুদার মতো করে সিগারেট মুখে গোঁজার পরে বাড়ির বড়দের নজরে পড়ে যাওয়ায় তৎক্ষণাৎ সেটা ফেলে দিতে তো হয়েছিলই, উপরন্তু ওই বয়সে সিগারেট মুখে দেওয়ায় গুরুজনদের থেকে আরও যা যা কপালে জুটেছিল, তা আর বলার বা লেখার মতো নয়। যাই হোক, ফেলুদার ওই স্টাইলটা কেন জানি না, মনের মণিকোঠায় একেবারে চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছিল।

তখন কিন্তু ভাললাগা মানে শুধুই 'ফেলুদা'। সেই চরিত্রে যাঁকে পর্দায় দেখা যাচ্ছে, তাঁর নামটাও জানতাম না। এমনকি 'ফেলুদা' এল কোথা থেকে, পর্দায় ওইসব কার নির্দেশে হচ্ছে, এমনকি 'সোনার কেল্লা'র গল্পটাই বা কার লেখা, এসব কিছুই জানতাম না। পরে বহু জায়গায় বহু বই, ছবি এবং সংবাদপত্রে, ওই সিগারেট মুখে দেওয়া ছবিটা দেখেছিলাম, তবে সেটা ফেলুদার মুখে নয়। ফেলুদার থেকেও লম্বা, একদম হলিউডের কোনও সিনেমার নায়কের চরিত্রে মানানসই একটা লোকের মুখে। আর দেখেই কেন জানি না, একটা অদ্ভূত ভাললাগা ও ভালবাসা চলে এসেছিল সেই সাড়ে ছয়ফুট দীর্ঘ লোকটার প্রতি। ভদ্রলোকের নামটা ততদিনে জেনে গেছি। প্রায় আমার নিজের নামের মতোই উচ্চারণ। তাই বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 'সত্যজিৎ' শব্দটার মধ্যেই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি ধীরে ধীরে।

আসলে সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে লিখতে বসলে, সে লেখা শেষ করা খুবই দুরূহ কাজ। সারা জীবন ভদ্রলোক যা যা করেছিলেন, তার যে কোনও একটা বিষয় নিয়ে গুণগতভাবে চর্চা করতেই সাধারণ লোকের গোটা জীবন পেরিয়ে যাবে। ৩৬ বছরের চলচ্চিত্রকার জীবনে ২৯ টি পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি এবং ৬ টি তথ্যচিত্র বা ডকুমেন্টরি পরিচালনা। প্রথম জীবনের ৬ টি ছবি বাদে বাকি সবকটির সঙ্গীত পরিচালনা, ফেলুদা এবং প্রোফেসর শঙ্কু চরিত্রে প্রায় ৮০ টি দীর্ঘ এবং নাতিদীর্ঘ গোয়েন্দা এবং কল্প-বিজ্ঞানের কাহিনী রচনা, শতাধিক ছোটগল্প লেখা এবং সর্বোপরি 'সন্দেশ' সহ অন্যান্য পত্রিকায় অগণিত চিত্রাঙ্কন—এই সবকটি কাজই সত্যজিৎ রায় তাঁর চল্লিশ বছরের কর্মজীবনে করেছিলেন। বিশ্বচলচ্চিত্রের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি The Bicycle Thief ছিল সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র নির্মাণের অনুপ্রেরণা। প্রথম ছবি 'পথের পাঁচালী' মুক্তি পেয়েছিল ১৯৫৫ সালে। অর্থাভাবে ছবি মুক্তির কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তদানীন্তন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়ের আনুকূল্যে ছবিটি মুক্তি পায়। ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে তা এককথায় মাইলস্টোন। আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। অপু-দুর্গার সেই মর্মস্পর্শী কাহিনীর সূত্র ধরেই পরের ছবি 'অপরাজিত' এবং 'অপুর সংসার' নির্মাণ। কলেজ জীবনে অজস্র নাটকে অংশগ্রহণ করা তরুণ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নজরে পড়ে গিয়েছিলেন সত্যজিতের। বাকিটা ইতিহাস। ১৪ টি ছবিতে সত্যজিৎ রায়ের সান্নিধ্য পেয়ে অভিনয় জীবনটাই বদলে গিয়েছিল সৌমিত্রবাবুর। 'অপুর সংসার' এর অপু, 'অভিযান' এর নরসিংহ থেকে চারুলতার 'অমল', সমাপ্তির 'অপূর্ব',সোনার কেল্লায় 'ফেলুদা', হীরক রাজার দেশের সেই অসীম সাহসী 'উদয়ন

পণ্ডিত', ঘরে বাইরের 'সন্দীপ' থেকে গণশত্রুর সেই ডাক্তার অশোক গুপ্ত—সত্যজিৎ রায়ের সুনিপূণ হাতে নানা আঙ্গিকে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

আর বাকি ছবিগুলোতে? সেখানেও অতুলনীয় চিন্তাশক্তির অধিকারী সত্যজিৎ রায় রেখেছিলেন তাঁর মৌলিকতা। 'মহানগর' ছবিতে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের স্বামী এবং স্ত্রীর সংসারের আর্থিক অনটন থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে একই সঙ্গে চাকরি করা এবং শেষে সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে দুজনেরই চাকরি হারানোর যে দৃশ্য পরিস্ফুটিত হয়েছিল, তা বাস্তবিকই অনবদ্য। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প অবলম্বনে 'পোস্টমাস্টার' ছবিতে 'রতন' এর ভূমিকায় চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসামান্য অভিনয় এবং পোস্টমাস্টারের বিদায়কালে তার সজল, করুণ মুখচ্ছবি পরশুরামের কাহিনী অবলম্বনে

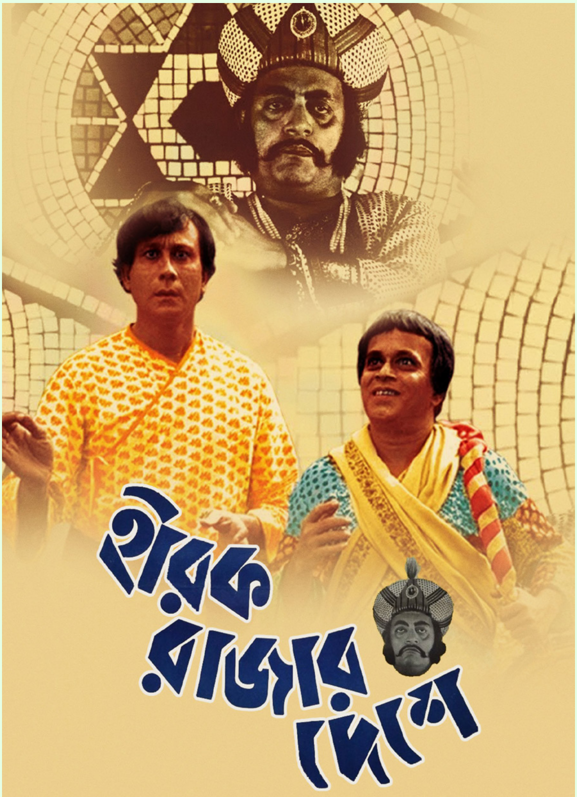

'মহাপুরুষ' ছায়াছবিতে বুজরুকির বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রুপাত্মক বার্তা,কাঞ্চন জঙ্ঘা ছবিতে পাহাড়ের নৈসর্গিক সৌন্দর্যের কোলে নীরব প্রেমের যে দৃশ্য বা 'জলসাঘর' এ জমিদার বিশ্বম্ভর রায়ের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের আভিজাত্যের যে ছবি সত্যজিৎ রায় দেখিয়েছিলেন, তা একজন গুণী পরিচালকের সর্বাঙ্গীণ শৈল্পিক বোধের পরিচয়।

এখানেই চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় অনন্য। সমসাময়িক ঋত্বিক ঘটক অযান্ত্রিক বা মেঘে ঢাকা তারা তৈরি করে, বা মৃণাল সেন 'নীল আকাশের নীচে' বা 'বাইশে শ্রাবণ' নির্মাণ করে যখন তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে ফেলে দিয়েছিলেন, তখনই এক নতুন সত্যজিত রায়ের আত্ম-প্রকাশ। ছোটদের ছবি 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' এবং নিজের গোয়েন্দা উপন্যাস 'সোনার কেল্লা'কে বড় পর্দায় নিয়ে আসা। বাংলা ছবিতে ততদিনে মূলধারার অনেক ছবিই তৈরি হচ্ছিল। ঋত্বিক ঘটক বা মৃণাল সেন ছাড়াও তপন সিংহ, অজয় কর, অসিত সেনের মতো কৃতী পরিচালকেরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। শুরু হয়ে গেছিল উত্তম যুগ।

সত্যজিৎ রায় নিজেকে অন্যভাবে নিয়ে এলেন এই ছোটদের ছবি তৈরির মাধ্যমে। ছোটদের মধ্যে তো বটেই, তাদের আগের প্রজন্মের মধ্যেও ব্যাপক সাড়া পড়ল এই দুটি ছবিকে ঘিরে। এর মধ্যে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' এ নিজের লেখা ছড়ায় সুর লাগিয়ে গান তৈরি করে এবং সিনেমায় গুপীর মুখে সেই গান লাগিয়ে সত্যজিৎ রায় প্রমাণ করলেন তাঁর সঙ্গীত বোধ কতটা গভীর। একটানা ১০২ সপ্তাহ চলেছিল এই ছবিটি, যা আজও ভারতীয় সবাক এবং নির্বাক চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক অনন্য নজির।

এই সময়ের একটু আগেই তিনি নির্মাণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প 'নষ্টনীড়' অবলম্বনে 'চারুলতা', যা তাঁর নিজের বিচারে তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবি। সত্তর দশকের উত্তাল রাজনৈতিক সময়ে যখন দারিদ্র্য, বেকারত্ব, দুর্নীতিতে সমাজ আচ্ছন্ন, সেই কঠিন সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই সত্যজিৎ রায় বানিয়েছিলেন 'সীমাবদ্ধ', 'প্রতিদ্বন্দ্বী' এবং 'জনঅরণ্য' নামে তিনটি

কলকাতা কেন্দ্রিক ছবি। এর মধ্যে 'জনঅরণ্য' যেমন বি-তর্কিত, তেমনি তার অন্তর্নিহিত অর্থটাও ততোধিক নিগূঢ়। যে কোনও কুসংস্কার, স্বেচ্ছাচার, সামাজিক ব্যধির বিরুদ্ধে তাঁর ভাবনাশক্তি তাঁর রূপদান অবিস্মরণীয়। 'হীরক রাজার দেশে' ছবিতে উদয়ন পণ্ডিতের অনাচারী হীরক রাজের বিরুদ্ধে অনমনীয় দৃঢ়তা, হিন্দি ছায়াছবি 'সদগতি'তে জাতপাতের বিরুদ্ধে তীব্র বার্তা, 'অশনি সঙ্কেত' এ দুর্ভিক্ষপীড়িত সমাজের অসহনীয় বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই প্রমাণ করেছে প্রবাদ-প্রতিম এই স্রষ্টার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী।

আশির দশকে স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশাত্ম-বোধক ছবি। জীবনের সায়াহ্নে এসে অশক্ত শরীরে বিজ্ঞান ও কুসংস্কারের দ্বন্দ্বমূলক ছবি 'গণশত্রু', পারিবারিক অস্থিরতার এক বাস্তব চিত্র 'শাখাপ্রশাখা' এবং অগাধ জ্ঞানের অধিকারী এক ব্যক্তি যিনি একটি পরিবারে অনাহুত অতিথি হয়ে আবির্ভূত হয়ে-ছিলেন-সেই রহস্যাবৃত গল্প 'আগন্তুক'—তিনটি ভিন্নধারার ছবির মাধ্যমে সত্যজিৎ রায় প্রমাণ করেছিলেন তিনি

কতটা আধুনিক এবং প্রগ-তিশীলতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর চোখ এমনভাবে কলা-কুশলীদের চিনতে পারত যে সেই চরিত্রে অন্য কোনও অভিনেতাকে ভাবাই যেত না। ভাবুন তো 'সোনার কেল্লা'য় মন্দার বোসের ভূমিকায় অখ্যাত কামু মুখোপাধ্যায় এবং তার দোসর ভবানন্দের ভূমিকায় অজয় বন্দ্যোপাধ্যয়ের অভিনয়। বা "জয় বাবা ফেলুনাথ" এ ভণ্ড সন্ন্যাসী মছলিবাবা রূপী মনু মুখার্জির অভিনয়।

সীমাবদ্ধ ছবিতে "বরুণ চন্দ" বা "জনঅরন্যের" প্রদীপ মুখোপাধ্যায়কে? 'আগন্তুক' এ মনমোহন মিত্রের চরিত্রটা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের খুব পছন্দ ছিল। করতেও চেয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়ের স্নেহধন্য এই অভিনেতা। কিন্তু উৎপল দত্তকে নেওয়ার পেছনে সত্যজিতের যুক্তি ছিল, উৎপল দত্তকে খলনায়ক চরিত্রে দর্শক সাদরে বরণ করে নিয়েছে। তাই 'অনাহুত অতিথি' বা 'জাল দাদুর' ভূমিকায় উৎপল দত্তই আদর্শ। কী অসামান্য দূরদর্শিতা!

আর বাঙালির ম্যাটিনি আইডল? উত্তমকুমার তো 'মহানায়ক' হয়েছি-লেন সত্যজিতের হাতে 'নায়ক' ছবিতে অভিনয় করেই! তাই শতবর্ষেও তিনিই ভারতীয় চলচ্চিত্রের 'মহারাজা'। তাঁর কথার রেশ ধরেই বলতে ইচ্ছে করছে, মহারাজা, তোমারে সেলাম।

গল্প

ভূতের রাজার চতুর্থ বর

স্বরূপ গোস্বামী

চরিত্রের নাম কুট্টুস। না, সে মোটেই কোনও সারমেয় নয়। এই সময়ের জল হাওয়ায় বেড়ে ওঠা এক কিশোর। পোশাকি নাম সবার একটা থাকে, তারও আছে। স্কুলের খাতায় সেই পোশাকি নামটাই আছে। বন্ধুরা সেই পোশাকি নামটা ধরেই ডাকে। সৌম্যজিৎ থেকে কেউ কেউ শর্টে সৌম্য করে নিয়েছে। তবে কুট্টুসের নিজের কিন্তু দিদির দেওয়া ওই নামটাই বেশি প্রিয়। আমরাও বরং তাকে কুট্টুস বলেই সম্বোধন করব।

ফোনের ওপর তার খুব আসক্তি। লোকের স্মার্টফোন দেখলেই চেয়ে নেয়। এটা সেটা গেম খেলে। কী কী অ্যাপ আছে, বোঝার চেষ্টা করে। কিন্তু বাড়ির লোক তাকে স্মার্ট ফোন কিনে দেয়নি। বাড়ির লোকের বক্তব্য, স্মার্টফোন নিলে ছেলে বখে যাবে। লেখাপড়া কিছু হবে না। সবসময় শুধু সোশাল সাইটেই মুখ গুঁজে থাকবে। কুট্টুসের খুব রাগ হয়, কিন্তু সে কিছু বলতে পারে না। দারুণ রেজাল্ট হলে তবু কিছুটা বলার মুখ থাকত। কিন্তু সেটাও হয় না। ফলে, বাড়ির লোক যা বলে, তাই শুনতে হয়। লোকের স্মার্টফোন ঘেঁটেই সান্ত্বনা পেতে হয়।

আঙুর ফল কখন টক হয়! যখন সেটা পাওয়া যায় না। কুট্টুসেরও হয়েছে সেই দশা। সে লোকের ইয়াব্বড় স্মার্টফোন দেখলে ইদানীং রেগে যাচ্ছে। মনে মনে বলছে, আমার যখন নেই, তখন কারও থাকার দরকার নেই। সব স্মার্ট ফোন হ্যাং করে যাক। তোরা ফেসবুক করবি, মেয়েদের সঙ্গে গল্প করবি, আর আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখব! কভি নেহি।

কুট্টুসের স্বপ্নগুলো ভারি অদ্ভুত। আর দশজন যা দেখে, সে তা দেখে না। সে যা দেখে, আর দশজন তা দেখে না। মাঝে মাঝেই সে নাকি ম্যাগি খাওয়ার স্বপ্ন দেখে। তাও আবার সকালের দিকে। সেই সময় যদি দিদি ঘুম ভাঙাতে আসে, কুট্টুস ঘুমের ঘোরেই বলে ওঠে, ‘প্লিজ, আর দশ মিনিট। ম্যাগিটা খেয়েনি। এই সময় জ্বালাবি না।’ দিনের

পর দিন সে ম্যাগি খেয়েই থেকেছে। ভাত-রুটি এসব কিছুই দরকার হয়নি। আর চিকেন। চিকেন থাকলে তার সঙ্গে সবকিছুই খেয়ে নিতে পারে। আপেলের সঙ্গে বেদানার তফাত কী, কুট্টুস জানে না। লাওয়ের সঙ্গে কুমড়োর তফাত কী, তাও জানে না। জানার দরকারই হয়নি।

মনে হত, ভূতের রাজা যদি বর দিত, রোজ চিকেনের নানা আইটেম আর নানা রকমের নুডলস চেয়ে নিত। কতবার ভূতের রাজাকে মনে মনে ডেকেছে, কিন্তু গুপী-বাঘাকে ছেড়ে সে ব্যাটা আসেইনি। ভেবেছে, সত্যজিৎ রায় সিনেমা বানিয়েছিল বলে আবার কেউ বোধ হয় সিনেমা বানাবে। যতই করো গুরু, গুপীও নেই, বাঘাও নেই, আর সত্যজিৎও নেই। সন্দীপ রায় যতই ফেলুদা করুক, সে এজন্মে আর গুপী-বাঘা করবে না। তোমার আর হিল্লে হল না। নিরেট বেকার হয়েই থাকতে হবে। আর ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে যাবে, আমি রব নিষ্ফলের হতাশের দলে।

অবশেষে একদিন, স্বপ্নে সত্যি সত্যিই হাজির ভূতের রাজা। অনেক ভাঁট বকে গেল। সেও 'মন কী বাত' শুনিয়ে গেল। ওরে ব্যাটা, তোর কাছে এসব ভাষণ কে শুনতে চায়! কাজের কথায় আয়। বর দিতে পারিস বলেই তো তোর এত কদর। পুজোর আগে ডিএ বা বোনাস দিতে হবে না। কী বর দিবি, চটপট বলে ফেল।

এতক্ষণে ভূত বাবাজীবন পথে এল। সে জানতে চাইল, কুট্টুস কী চায়। এক লহমায় কুট্টুস ভেবে নিল, গুপী-বাঘা কী কী চেয়েছিল?

১) যেথা খুশি যাইতে পারি।
২) যা খুশি, খাইতে পারি।
৩) মনের সুখে গাইতে পারি।

তিন নম্বরটায় কুট্টুসের কোনও আগ্রহ নেই। যাদের খেয়েদেয়ে কাজ নেই, তারা গান গায়। আর গাইলেই লোকে শুনবে কেন?

এখান-ওখান যাওয়াতেও তেমন আগ্রহ নেই। পাহাড়, সমুদ্র ঘোরা হয়ে গেছে। একা একা আর কোথায়ই বা যাবে! বাবা-মা নিয়ে গেলেও মুশকিল। এটা করিস না, ওটা করিস না, এসব ফিরিস্তি চলবে। তাছাড়া, ভূতের রাজার বরের প্যাকেজে বাবা-মা নাও থাকতে পারে।

বন্ধু নিলেও মুশকিল। বাড়ির লোক ছাড়বে না, না বলে নিয়ে গেলে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দেবে। কিডন্যাপিংয়ের কেস দিয়ে দেবে। এখন তো আবার টাওয়ার ধরে পুলিস ঠিক খুঁজে নিচ্ছে। যত্তসব উটকো ঝামেলা।

তার থেকে খাওয়ায় ফোকাস করলে ভাল হয়। সেখানেও একগুচ্ছ খাবার চেয়ে কী হবে? আরও শর্টলিস্ট করা দরকার। আগে চিকেন নাকি ম্যাগি! বেশ দ্বিধায় কুট্টুসবাবু। ভূতের রাজা জানিয়ে দিল, যে কোনও একটি বর।

গুপী–বাঘা যেগুলো চেয়েছিল, ওগুলো আর দেওয়া যাবে না। অন্য কিছু চাইতে হবে।

এ তো আচ্ছা কিপ্টে ভূত। এ ব্যাটাও নির্ঘাত ডি এ পায়নি। তাই মুখ কঞ্জুসিগিরি করছে। বেড়ানো আর গানটা নিজেই ছেঁটে ফেলেছিল। রেখেছিল শুধু খাওয়াটুকু, তাও মন্ডা, মিঠাই নয়, শুধু মোগলাই –চাইনিজ, তাতেও এত কিপ্টেমি! মাঝে মাঝে হয়ত আরসালান থেকে বিরিয়ানি বা সিরাজ থেকে মটন চাঁপ চাইত। এতে ভূতের রাজা গরিব হয়ে যাবে! শুধু খাওয়াটাই দেখল! এর মধ্যে ছোট্ট একটা ছেলে কেমন সম্প্রীতির বার্তা দিতে চাইছে, সেটা বুঝল না! এত বুঝলে কি আর ভূত হত! বুঝলে তো বুদ্ধিজীবী হয়ে চ্যানেলে বসত।

কুট্টুস ভাবল, এই সুযোগে একটা অ্যান্ড্রয়েড ফোন চেয়ে নিলে কেমন হয়! বাড়ির লোক দিতে চাইছে না। ভূতের রাজার সৌজন্যে যদি পাওয়া যায়! সঙ্গে একটা জিও সিম বা আনলিমিটেড নেট প্যাক।

####

ভূতের রাজা অন্তর্যামী। সে মনের ইচ্ছে মুখে আসার আগেই বুঝে ফেলে। সে বলে উঠল, ওসব অ্যান্ড্রয়েড–ফ্যান্ড্রয়েড দেওয়া যাবে না। ওগুলো আজকাল সবার হাতে হাতে ঘুরছে। ওগুলো দিয়ে আজকাল কোনও স্টেটাস বোঝানো যায় না। ওগুলো নিয়ে বোকা লোকেরা ঘোরাফেরা করে ।

এ তো মহা ফ্যাসাদে পড়া গেল। এ ব্যাটা তো একের পর এক শর্ত দিয়ে যাছে।

১) গুপী–বাঘাদের বর চাওয়া চলবে না।

২) স্মার্টফোন চাওয়া চলবে না।

এবার তাহলে কী চাওয়া যায়? ওদিকে, ভূতের রাজার হাতে সময় নেই। কখন ফুড়ুৎ করে ভ্যানিস হয়ে যাবে, তখন আর কিছুই পাওয়া যাবে না।

আরও এক মোক্ষম শর্ত দিয়ে বসল ভূতের রাজা। নিজের জন্য কিছুই চাওয়া যাবে না। সবাই তো নিজের জন্য চায়। তাই নিজের জন্য দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। তুমি এমন কিছু চাও, যা তোমার নিজের কাজে লাগবে না। অথচ, তুমি চাইলে অন্যদের বেকায়দায় ফেলে একটু আনন্দ পেতে পারো।

অবশেষে এসে গেল সেই মোক্ষম আইডিয়াটা। এতদিন যেটা সে মনে মনে পুষে রেখেছিল। ভূতের রাজার কাছে বলেই ফেলল, এমন একটা বর দাও, আমি যখন চাইব, আমার সামনে থাকা লোকটার স্মার্ট ফোনটা হ্যাং হয়ে যাবে। আবার আমি যখন চাইব, তখন চালুও হয়ে যাবে।

ভূতের রাজা বলল, সাবাস। এতদিনে কেউ একটা বরের মতো বর চাইল। তথাস্তু। বৎস, তুমি জানো না, তুমি সমাজের কী উপকার করতে চলেছ। এমনিতে তোমার কোটা ছিল একটা বরের। আমি খুশি হয়ে লিমিটটা

একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি। শুধু তোমার সামনে থাকা লোকটার নয়, যে তোমার সামনে নেই, তুমি মনে মনে তার মুখ ভেবে স্মার্টফোনের কথা ভাবলে তার ফোনটাও হ্যাং হয়ে যাবে। আজ সকাল থেকেই ভ্যালিডিটি শুরু হয়ে যাচ্ছে। নাও, এবার তোমার কেরামতি শুরু করে দাও।

#####

সকালে একটু দেরিতেই ঘুম ভাঙল। স্বপ্নের কথাটা ঠিক মনেও ছিল না। আজ সাতটা থেকে পার্থ স্যারের কাছে টিউশন। অঙ্ক পড়ায়। কিন্তু ওই এক রোগ। অঙ্ক দিয়ে নিজে চ্যাট করতে বসে যায়। শেখানোর দিকে মনই থাকে না। সেলফি তোলে, কাকে যে পাঠায়, কে জানে!

হঠাৎ কুট্টুসের মনে পড়ে গেল ভূতের রাজার দেওয়া বরটা। তাহলে, পার্থ স্যারের ওপরেই আগে প্রয়োগ করা যাক। একবার পার্থ স্যারের দিকে, একবার হাতে থাকা স্মার্টফোনটার দিকে তাকাল।

কিন্তু কাজ হল কী?

স্যারের অঙ্কে মন নেই। কুট্টুসেরও।

স্যারের মুখের জ্যামিতিটা কেমন যেন বদলে যাচ্ছে। সেলফি তুলছে, উঠছে না। নেট কাজ করছে না। ছটপটানি বাড়ছে। এদিকে, মনে মনে কুট্টুস তখন ধন্যবাদ দিয়ে চলেছে ভূতের রাজাকে।

বাকিরা ঠিক বুঝতে পারছে না। দু একজনকে বলাই যায়। থাক, এখন পাঁচকান করে লাভ নেই। সব ঘেঁটে যাবে।

পার্থ স্যারের মেজাজ বিগড়ে গেছে। সেই রাগটা ছাত্রদের ওপর ঝাড়ছে। বলছে, এই সহজ অঙ্কটা করতে পারছিস না? তোদের তাহলে কী শেখালাম? এবার কুট্টুসের খাতা দেখার পালা। সেও অঙ্কটা ঠিকঠাক করতে পারেনি। নির্ঘাত বকুনি। হঠাৎ মনে হল, এখন যদি কিছুক্ষণের জন্য নেট ফিরিয়ে দিই, কেমন হয়! মনে মনে নেট ফিরিয়ে দিল। স্যারের মোবাইল জানান দিল, মেসেজ ঢুকছে। স্যার যেন হাতে চাঁদ পেল। মন চলে গেল ফোনের দিকে। তার ছবিতে কে লাইক দিয়েছে, দেখতে চাইল। হোয়াটস অ্যাপ খুলল। কে কে গুডমর্নিং বলেছে। মেজাজটা আবার ফুরফুরে। তাই কুট্টুসকে বকা খেতে হল না।

টিউশনি থেকে বেরোনোর সময় মনে হল, আবার নেট উড়িয়ে দেওয়া যাক। তাই হল। বাকি দিনটা পার্থ স্যারের কেমন গেল, কে জানে!

####

বাড়ি ফেরে স্নান টান সেরে স্কুলে গেল। আজ একটু আগেই পৌঁছে গেল। নইলে কেরামতি বুঝবে কী করে? অর্ণব রোজ স্মার্ট ফোন আনে। এই বয়সেই অনেক বান্ধবী জুটিয়ে ফেলেছে। দামী ফোন, মেয়েরা তো আগ্রহ দেখাবেই। দাঁড়া, ব্যাটা। আজ তোর হচ্ছে।

অর্ণব যথারীতি ফোন ঘাঁটতে শুরু করেছে। ক্লাস চলাকালীন সে মিউট করে ভিডিও দেখে। তাই পেছনের দিকে বসে। দাঁড়া, আজ তোর

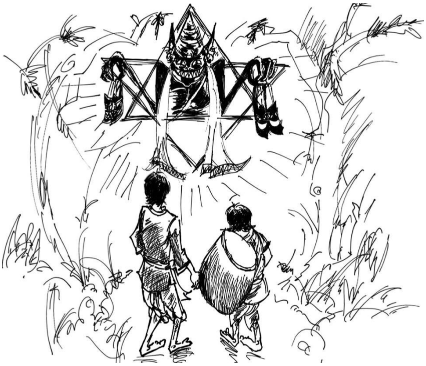

ভিডিও দেখা বের করছি। কুট্টুসের কেরামতি শুরু। অর্ণবের ফোন কাজ করছে না। বারবার খুলছে। কোনও সিগনাল পাচ্ছে না। অগত্যা, থার্ড পিরিয়ডের পর বাড়ি চলে গেল। নিশ্চয় বাড়ি যাওয়ার আগে মোবাইলের দোকানে যাবে। যেখানেই যাও বাপু, কোনও দোকানদার ঠিক করতে পারবে না। বেশি পাকামি করলে ওর দোকানের ফোনগুলোকেও ভ্যানিস করে দেব।

টিফিনের সময় একবার টিচার্স কমনরুমের দিকে গেল কুট্টুস। মাস্টারদেরও এই এক বদগুণ। সারাক্ষণ শুধু ফেসবুক আর ফেসবুক। দাঁড়ান স্যারেরা, এবার আপনাদের টাইট দেব। পড়ানোর বদলে ফেসবুক। বের করছি। কমনরুমে থাকা সবার মুখের একবার তাকিয়ে নিল। তারপরেই চলে এল। দশ মিনিট পর মনে হল, সরেজমিনে একবার দেখে আসা দরকার।

যা ভেবেছিল, ঠিক তাই। সবার চোখে মুখেই হতাশা। এ ওকে ফোন দেখাচ্ছে, ও বলছে, আমারটা দেখ। যে যাকেই দেখাও বাপু, আজ আর কারও ফোনই চলবে না। মনে মনে ভূতের রাজাকে বলল, বাড়ি ফেরার আগে যেন কারও ফোন না চালু হয়।

#####

ফেরার পথে দেখা হল পল্টুদার সঙ্গে। একটাই কাজ। সারাদিন নানা কায়দায় ছবি তোলা। আর পোস্ট করা। কটা লাইক পড়ল, মিনিটে মিনিটে দেখা। ভারী আমার উত্তম কুমার। যেন কত সুচিত্রা–সুপ্রিয়া ওর জন্য অপেক্ষা করে আছে। এসব না করে নিজের কাজে মন দে। দাঁড়া, তোর মজাও দেখাচ্ছি। কুট্টুসের নিদান। সপ্তাহে একদিন এর ফোন কাজ করবে। সেদিন যা পারিস, করে নে। বাকি ছদিন ফোন কাজ করবে না।

পাড়ার মিষ্টির দোকান। ছোকরার ব্যবসায় মন নেই। সারাক্ষণ খুটখাট। কানে ফোন নিয়ে কার সঙ্গে যে এত কথা বলে! ওসব না করে যদি পড়ায় মন দিতিস, তাহলে আজ মিষ্টির দোকান চালাতে হত না। কলেজে পড়াতিস বা আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতিস। এ ব্যাটাকেও একটু টাইট দিতে হবে। কুট্টুস দোকানে গিয়ে একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস কিনল। তারপরই মনে মনে বলল, এর ফোনে পুরুষদের ফোন আসুক, খদ্দেরের ফোন আসুক, কিন্তু কোনও আউটগোয়িং যেন না হয়। বিশেষ করে কোনও মহিলাকে যেন ফোন না করতে পারে। তিনদিন পর কুট্টুস ফের গিয়ে দেখল, ছেলেটা ফোনের চক্কর ছেড়ে দোকানে মন দিয়েছে। এদিকে, পরেরদিন পার্থ স্যার ফোন চেঞ্জ করেছে। কিন্তু বিশেষ লাভ হয়নি। যথারীতি নতুন ফোনটিও কুট্টুসের 'কৃপাদৃষ্টি' থেকে বঞ্চিত হয়নি। অর্ণব বা পল্টুদা ফোনের দোকানে নিয়ে গিয়েছিল। তারাও বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। তাদের ফোনগুলোও সেভাবেই চলেছে, যেভাবে কুট্টুস চেয়েছে।

স্কুলের স্যারদের অনেকে ফোন আনাই বন্ধ করে দিয়েছেন। কেউ কেউ সেই প্রাচীন ফোনে ফিরে এসেছেন। হেড স্যার খুব খুশি। এতদিন কেউ তাঁকে পাত্তা দিতেন না। টিচাররা সময়মতো ক্লাসে যেতেন না। কমনরুমে সবসময় ফোন ঘাঁটতেন। হেড স্যারের সঙ্গে সামান্য মনোমালিন্য হলে ফেসবুকে দিয়ে দিতেন বা ডিআই অফিসে মেল করে দিতেন। তাঁকেও টেনশনে থাকতে হত। এখন তিনিও নিশ্চিন্ত। স্কুলের পরিবেশ আবার ফিরে আসছে।

####

কিন্তু ভূতের রাজা তো একটা বাড়তি বরও দিয়েছিল। মনে পড়ে গেল কুট্টুসের। সে মনে মনে যার কথা ভাববে, তাদের ফোনও তো চাইলে হ্যাং করে দিতে পারে। বা নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে। তার মানে, সে যখন স্কুলে, তখন তো সরকারি অফিসের কোনও কর্মী ফেবুতে মগ্ন। রাতের বেলায় অনেকেই না তো না পড়াশোনা করে, না ঘুমিয়ে এসব করে চলেছে। সেগুলোকে কীভাবে আটকানো যায়!

আবার সবাইকে কড়া শাস্তি দেওয়াও ঠিক নয়। অনেকের সত্যিই জরুরি ফোন আসে। তাহলে কীভাবে বুঝবে কারটা জরুরি, কারটা নয়। মনে হল, একটু গ্রেস দেওয়া দরকার। নিজেই সংবিধান তৈরি করে নিল। তার পরিচিত লোকেরা ফোন করতে পারবেন। কিন্তু পাঁচ মিনিট পর লাইনটা কেটে যাবে। এক নম্বরে সর্বোচ্চ দুবার করা যাবে। রাত দশটার পর কারও ফেসবুক খুলবে না। যদি পড়াশোনার কাজে নেট ব্যবহার করতে চায়, খোলা যাবে। কিন্তু নো ফেসবুক, নো হোয়াটস অ্যাপ, নো সেলফি। যে বাইক চালাতে চালাতে ফোন ধরবে, আগামী পনেরো দিন সে আর ফোনে কথা বলতে পারবে না। কোনও

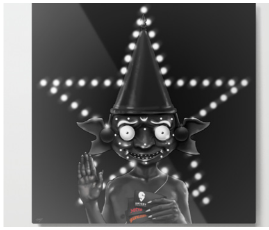

ডাক্তার যদি রোগী দেখতে দেখতে নেটে চোখ রাখে, আগামী পনেরো দিন তারও নেট খুলবে না। কোনও সরকারি বা বেসরকারি অফিসে কেউ যখন কাজ করছে, তার সোশাল সাইট খুলবে না। এসব নিয়ম চালু করল আর মনে মনে ভাবতে লাগল, এবার কাদের ঠান্ডা করা যায়।

এভাবেই কেটে গেছে বেশ কয়েকদিন। এক রাতে হঠাৎ হাজির ভূতের রাজা। সে হাজির আরসালানের বিরিয়ানির প্যাকেট নিয়ে। বলল, তুমি গুপী-বাঘার থেকে ঢের ভাল। ওরা শুধু নিজেরা পেট পুরে খেয়েছে, আর ঘুরে বেড়িয়েছে। সুন্দরী রাজকন্যে-দের বিয়ে করেছে। কিন্তু মাত্র কদিনে তুমি সমাজটাকেই বদলে দিয়েছ। সব অফিসে কর্ম সংস্কৃতি ফিরে এসেছে। শিক্ষকরা স্কুলে যাচ্ছে, মন দিয়ে পড়াচ্ছে, ডিএ নিয়ে ফেসবুকে হতাশা দেখাচ্ছে না। সরকারি অফিসে কাজ হচ্ছে। ছেলেরাও মন দিয়ে পড়ছে। তাই তোমার জন্য এই বিরিয়ানির প্যাকেট এনেছি।

মাঝরাতেই সেই বিরিয়ানি শেষ করে ফেলল কুট্টুস। তারপর ভূতের রাজা পকেট থেকে বের করল একটা অ্যান্ড্রয়েড ফোন। বলল, এটা তোমার উপহার। সঙ্গে একটা আনলিমিটেড নেট প্যাক।

কুট্টুস বলল, কিন্তু তুমি যে বলেছিলে, নিজের জন্য কিছু চাওয়া যাবে না।

ভূত বলল, তুমি তো চাওনি। আমি খুশি হয়ে তোমাকে দিচ্ছি। ফোন কোম্পানি দুটো অ্যান্ড্রয়েড দিয়েছে। একটা আমার, একটা তোমার।

ও, তার মানে এ ব্যাটাও ফোন কোম্পানিগুলোর কাটমানি খেয়ে বসে আছে! কুট্টুস ফিরিয়ে দিল সেই ফোন। বলল, আমার ফোন দরকার নেই। লোকের ফোন হ্যাং করেই আমি দিব্যি আনন্দ পাচ্ছি। দাঁড়াও, এবার তোমার ফোনটা হ্যাং করছি। তোমার দালালি করা বের করছি। ভূতের রাজার দেওয়া বরটাই ভূতের রাজার ওপর প্রয়োগ করল—এবার স্বয়ং ভূতের রাজার ফোন হ্যাং।

রবি ঠাকুরের সুরে কিশোর কুট্টুস গেয়ে উঠল,

আমার এই হ্যাং করাতেই আনন্দ।।

স্মৃতিটুকু থাক

নন্দনের সেই বিকেল

রাতুল ভট্টাচার্য

আমি সেবার উচ্চমাধ্যমিক দেব। ফেলুদার অনেক গল্পই পড়ে ফেলেছি। বেশি ভাল লাগত তোপসেকে। কারণ, সে আমারই বয়সি। বারবার মনে হত, ফেলুদা ছাড়া তোপসে নিজে কবে সমাধান করবে? একবার নন্দনে গিয়েছিলাম। দেখলাম, সত্যজিৎ রায় বেরিয়ে আসছেন। পরনে পাজামা আর পাঞ্জাবি। খুব গম্ভীর। এত কাছে ফেলুদার স্রষ্টা! নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না।

কাছে যেতে খুব ভয় করছিল। তবু কী মনে হল, কাছে চলে গিয়ে প্রণাম করলাম। উনি হাসলেন। বললাম, আমি তোপসের খুব ভক্ত। উনি বললেন, হঠাৎ তোপসে! ফেলুদা নয় কেন? আমি বললাম, তোপসে আমার বয়সি। ওর সাফল্যকে নিজের সাফল্য মনে হয়। ওর চিন্তার সঙ্গে আমার চিন্তা মিলে যায়। কিন্তু আমার একটা আবদার আছে। উনি বললেন, বলো। বললাম, তোপসে কি বড় হবে না? ওকে একা ছেড়ে দিন না। সে-ও কিছু সমাধান করুক।

এতটুকুও বিরক্ত হলেন না। উনি হাসতে হাসতে বললেন, 'তাহলে যে ফেলু একা হয়ে যাবে। তোপসে ছাড়া সে-ও যে অসম্পূর্ণ।' তারপর আর কখনও দেখা হয়নি। দু'বছর পর পেলাম তাঁর মৃত্যুসংবাদ। আজ আমি পঞ্চাশের দোরগোড়ায়। পুত্র থাকলে সে তোপসের বয়সী হত। পরে কিংবদন্তি পরিচালকের অনেক ছবিই দেখেছি। কিন্তু সত্যজিৎ রায় বলতেই সেই দৃশ্যটা বারবার মনে পড়ে যায়।

মিঠুন, অমিতাভের বৃত্তেই হয়ত আটকে থাকতাম

অম্বরীশ হালদার

প্রথমেই বলে রাখি, আমি মোটেই চলচ্চিত্র বোদ্ধা নই। সত্যজিৎ রায়ের সব ছবি দেখেছি, এমন দাবিও করব না। অনেক ছবি হয়ত ছোটবেলায় দেখেছি। তখন বুঝেছি তখনকার মতো করে। পরে বড় হয়ে যখন আবার দেখেছি, সেই ছবিই অন্য চেহারায় ধরা দিয়েছে। কোনও ছবি সেই ছোটতে দেখেছি, আর দেখাই হয়নি। ফলে, মনের মধ্যে ভাসা ভাসা থেকে গেছে।

আমাদের বেড়ে ওঠা মূলত আটের দশকে। সেই সময়ে অমিতাভ বচ্চন কিছুটা যেন আড়ালে। উঠে আসছেন মিঠুন চক্রবর্তী। ডিস্কো ড্যান্সার, ওয়াক্ত কি আওয়াজ, প্যার ঝুকতা নেহিতে মজে থাকা কিশোর দল ভিড় করছে মফস্বলের ভিডিও হলে। মাঝে মাঝেই সেখানে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখানো হচ্ছে অমিতাভের সাতের দশকের ছবিগুলো। অমিতাভ পন্থী বনাম মিঠুন পন্থী। পরিষ্কার যেন দুটো শিবির। এরই মাঝে কখনও জিতেন্দ্র, কখনও ধর্মেন্দ্র, কখনও শত্রুঘ্ন সিনহা বা বিনোদ খান্নারাও ঢুকে পড়ছেন।

এই আবহে যখন কৈশোর কাটছে, তখন সত্যজিৎ রায় নেহাতই বোরিং একটা ব্যাপার। তাছাড়া, তখন পরিচালকের নামে ছবিকে চিনব, এমন বয়সও হয়নি। কোন ছবির কি হিরো, কে হিরোইন, এটাই মানদণ্ড। সেইসব ভিডিও হলে মাঝে মাঝে বাংলা ছবি চলত ঠিকই, তবে তা রঞ্জিৎ মল্লিক, চিরঞ্জিৎ বা পরের দিকে তাপস পাল, প্রসেনজিৎদের। উত্তম–সৌমিত্র তখন অনেকটাই যেন ব্যাকডেটেড। আর সত্যজিৎ রায়! ওই মফস্বলি ভিডিও হলের ম্যাটিনি শো–তে তাঁর প্রবেশাধিকার নেই।

তবে, ভিডিও–র পাশাপাশি সবেধন নীলমণি দূরদর্শনও তো ছিল। সেখানে শুরুতে শনিবার বাংলা ছবি, রবিবার হিন্দি ছবি। পরেরদিকে ব্যাপারটা উল্টো গেল। শনিবার হিন্দি ছবি, রবিবার বাংলা ছবি। সেখানে অবশ্য মাঝে মাঝে সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা দিত। শুরুর দিকে একেবারেই দেখতাম না। মনে হত, ধুর, এসব প্যানপ্যানানি ছবি কেউ দেখে নাকি!

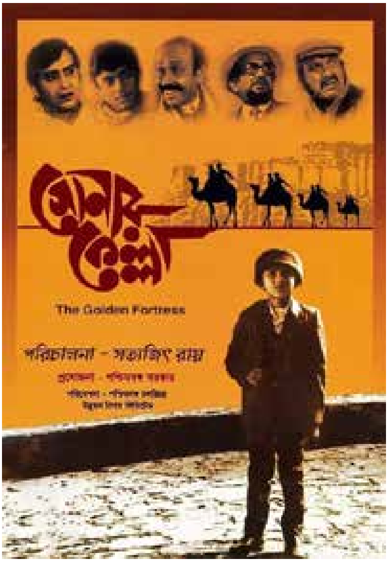

যাঁদের বাড়িতে টিভি দেখতে যেতাম, তিনি পাড়াতুতো জেঠু। একসময় মাস্টারমশাই ছিলেন। কে কোন ছবি দেখছে, খেয়াল রাখতেন। আমি যে সত্যজিৎ রায়ের ছবিগুলো এড়িয়ে যাচ্ছি, উনি ঠিক নজর করেছি-লেন। একদিন বললেন, 'হ্যাঁরে, তুই প্রতি শনি–রবিবারে আসিস। আর যেগুলো দেখার মতো ছবি, সেই দিনগুলোতেই আসিস না!' আমি কিছুটা লজ্জাই পেয়ে গেলাম। কী করে বোঝাই, আমি তখন ডিস্কো ড্যান্সারের দর্শক। সেই জেঠু বললেন, 'কাল আসবি। কাল সত্যজিৎ রায়ের হীরক রাজার দেশে দিয়েছে। দেখবি, ভাল লাগবে।'

সত্যজিৎ রায়ের টানে নয়, বরং বলা যায়, সেই জেঠু বলেছিলেন বলেই দেখতে গেলাম। মনে হল, এই ছবিটা যদি না দেখি, পরের ছবিগুলো হয়ত দেখতে দেবেন না। এই ভেবেই যাওয়া। রবি ঘোষকে চিনতাম। সৌমিত্র চ্যাটার্জিকেও চিনতাম। উৎপল দত্তকেও চিনতাম। কিন্তু তপেন চ্যাটার্জি আমার কাছে অচেনা। ছড়ার ছন্দে একটু একটু করে এগোচ্ছে ছবিটা। বেশ লাগছে। মনে আছে, তখন ছড়াগুলো না বুঝেই মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। যখন তখন বলতে লাগলাম, দড়ি ধরে মারো টান, রাজা হবে খান খান। লেখাপড়া করে যে, অনাহারে মরে সে। বাহ। বেশ মনের মতো লাইন তো। বাড়িতে যখন পড়তে বসতে বলত, তখন এই ছড়াটা বেশ কাজে লেগে গেল। ইস্কুলেও বন্ধুদের শোনাতে লাগলাম, লেখাপড়া করে যে, অনাহারে মরে সে।

সেই নেশা ধরল। এবার দেখলাম সোনার কেল্লা। গুপী গাইন বাঘা বাইন। এ তো দারুণ ছবি। বেশ লাগছে। আমার চিন্তা–চেতনার জগৎ যেন একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে। যে আমি ডিস্কো ড্যান্সারের গান করতাম। যে আমি অমিতাভের ঢিসুম ঢিসুমের ভক্ত ছিলাম, সেই আমার মধ্যে এ কী আমূল রূপান্তর! এভাবেই কখনও দেখেছি অপুর সংসার, কখনও আবার গণশত্রু। আর একেবারে শেষবেলায় এসে আগন্তুক। এই ছবিটা যে কতবার দেখেছি। অন্তত বার তিরিশেক তো হবেই।

খুব মনে পড়ে সেই পাড়াতুতো জেঠুর কথা। তখন মনে হত, লোকটা খুব জ্ঞান দেয়। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতাম। কিন্তু এখন বুঝি, কী মোক্ষম শিক্ষাটাই না দিয়ে-ছিলেন। তিনি যদি সেই সময় হীরক রাজার দেশে না দেখতে বলতেন, আমি হয়ত সত্যজিৎকে চিনতাম আরও দেরিতে। হয়ত মিঠুন–অমিতাভের বৃত্তেই আটকে থাকতাম।

মুকুলের ছায়া থেকে এখনও নিস্তার নেই কুশলের

সোনার কেল্লার সেই মুকুল। আজকের কুশল চক্রবর্তী। মাঝে পেরিয়ে গেছে ৪৬ বছর। এখনও তাড়া করে বেড়ায় সেই মুকুল নামটা। মুগ্ধতা নাকি দীর্ঘশ্বাস! কেমন ছিল শুটিংয়ের মুহূর্তগুলো? সত্যজিৎ রায়কে ঘিরে টুকরো টুকরো অনেক স্মৃতি। বলে গেলেন কুশল। লিখলেন স্বরূপ গোস্বামী ।।

দেখতে দেখতে ৪৬ বছর হয়ে গেল সোনার কেল্লার। একটা ছবি। গোটা জীবনটাকেই আমূল বদলে দিল। দেখতে দেখতে আমার বয়সও ৫৪ পেরিয়ে গেল। কত রকম ছবি করলাম। কত ছবির পরিচালনা করলাম। টিভির দুনিয়াতেও প্রায় তিন দশক কেটে গেল। অথচ, এখনও আমি সেই মুকুল। এখনও কেউ কেউ ওই নামেই ডেকে ওঠে। আসলে, কুশল চক্রবর্তী মানেই মুকুল, এটাই অনেকে মনে রাখতে চায়। আমিও কি ভুলতে পেরেছি সোনার কেল্লার ওই টুকরো টুকরো মুহূর্তগুলো!

কীভাবে যোগাযোগ ?

সোনার কেল্লা যখন মুক্তি পায়, আমার বয়স তখন মাত্র ছ'বছর। ওই বয়সে কে সত্যজিৎ রায়, কে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, এসব বোঝার কথা নয়। অভিনয়ে নামব, এমন ভাবনাও আসার কথা নয়। আসলে, আমার অভিনয় কিছুটা হঠাৎ করেই। আরও দু'বছর পিছিয়ে যাই। আমার বয়স তখন মাত্র চার বছর। নিজের মনেই নানারকম ছবি আঁকতাম। বাবা সেগুলোকে এখান ওখানে পাঠাতেন। একবার একটা পত্রিকায় আমার ছবি ছাপা হল। সেই ছবিটা দেখে মানিক জেঠুর ভাল লাগে। তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। বাবার সঙ্গে গিয়েছিলাম মানিক জেঠুর বাড়িতে। সেই শুরু। তার বছর দুই পর মানিক জেঠু বাবাকে একটা চিঠি লিখলেন। জানান, তিনি সোনার কেল্লা ছবি করতে চান। আমাকে মুকুলের চরিত্রে ভেবেছেন।

প্রোডিউসার পাওয়া যাচ্ছিল না!

তিনি তো ভাবলেন। আমি মুকুলের রোল করব, মোটামুটি ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু নতুন এক বিভ্রাট। কারণ, ছবির প্রোডিউসার পাওয়া যাচ্ছিল না। সত্যজিৎ রায়ের মতো পরিচালক সোনার কেল্লা করবেন, অথচ প্রোডিউসার পাচ্ছেন না, ভাবা যায় ! কিন্তু এমনটাই হয়েছিল। কারণ ? নায়িকা নেই, গান নেই। এমন ছবিতে কে আর টাকা ঢালতে চায়? অথচ, সত্যজিৎ রায় যে তখন আনকোরা পরিচালক ছিলেন, এমনও নয়। কারণ, তার

প্রায় কুড়ি বছর আগে পথের পাঁচালি বেরিয়ে গেছে। প্রোডিউসার যখন নেই, তখন কী আর করা যাবে! আমরা তখন বিরাটিতে থাকতাম। বাড়িতে টেলিফোনও ছিল না। মানিক জেঠু বাবাকে চিঠি লিখলেন। জানালেন, আমার প্রোডিউসার পালিয়েছে। গান আর নায়িকা বর্জিত ছবিতে টাকা দিতে চায়নি। যদি হয়, পরে জানাব।

ইউনিট যেন পরিবার

ছবির কাজ তো শুরু হয়ে গেল। দেড় মাসের আউটডোর। তাও আবার রাজস্থানে। ছ বছরের একটা ছেলের পক্ষে এতদিন বাড়ির বাইরে থাকা কতখানি কষ্টকর, নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। বাবা অবশ্য সঙ্গে গিয়েছিল। কিন্তু কীভাবে জানি না, ইউনিটের সবার সঙ্গেই দারুণ সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল। সবাই আমাকে খুব ভালবাসতেন। সবমিলিয়ে আমরা একটা পরিবার হয়ে উঠলাম। দিল্লি থেকে জয়পুর। সেখান থেকে যোধপুর, বিকানির, জয়সলমির। তখন খুব ঠান্ডা। যাওয়ার আগে আমার জন্য দুটো পুল ওভার বোনা হয়েছিল। একটা বুনেছিল মা। আরেকটা জেঠিমা (মানিক জেঠুর স্ত্রী, বিজয়া রায়)। আমার জন্য যে লাল রঙের পুল ওভারটা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল,

সেটা বেশ টাইট। মনে আছে, জেঠিমা সেটাকে আবার খুলে ওপর দিকটা নতুন করে বুনলেন। গলাটা আলগা করে দিলেন। আমরা যখন সোনার কেল্লা করতে গিয়েছিলাম, তখন জয়সলমিরে মাত্র একটা হোটেল ছিল। ফলে, যাওয়ার সময় আমরা বস্তায় করে চাল, ডাল, সব নিয়ে গিয়েছিলাম।

দাবায় হারিয়েছিলাম।

আমি বলতাম, মানিক জেঠু। তিনি সবাইকে সব ব্যাপারে জ্ঞান দিচ্ছেন। আবার আমার সঙ্গে যখন কথা বলছেন, তখন একেবারে আমার ভাষায়। খুব সহজ করে সবকিছু বুঝিয়ে দিচ্ছেন। উনি যে কত বড় পরিচালক, তা বোঝার মতো বয়স বা বুদ্ধি, কোনওটাই আমার ছিল না। তবু কেন জানি না, মানুষটাকে বেশ ভাল লাগত। আমি দাবা খেলতে ভালবাসতাম। উনিও আমার সঙ্গে দাবা খেলতে বসে যেতেন। তাঁর যতই বুদ্ধি থাক, তিনি ভাল দাবা খেলতে পারতেন না। এমনকি আমার কাছেও মাঝে মাঝে হেরে যেতেন। মানিকজেঠুকে হারিয়ে আমি খুব আনন্দ করতাম।

ব্যাপারটা বাবার ভাল লাগেনি। বাবা আমাকে ওভাবে আনন্দ করতে বারণ করলেন। তখন মানিকজেঠু বাবাকে বললেন, ও বাচ্চা ছেলে। একটু আনন্দ করছে। করুক না, ওকে বারণ করছ কেন ?

প্রশ্নের সন্ত্রাস

লোকেশানে যাওয়ার আগে আমি মানিকজেঠুর পাশে বসতাম। আমার মনে তখন কতরকম প্রশ্ন। যাকে কাছে পাচ্ছি, তাকেই প্রশ্নবানে জর্জরিত করে দিচ্ছি। কখনও সৌমিত্রকাকুকে, কখনও সন্তোষ জেঠুকে, কখনও কামু জেঠুকে। কখনও জানতে চাইছি, রাতে

তারা দেখা যায় কেন? কখনও বলছি, সপ্তর্ষি-মণ্ডল কোনটা, কখনও জিজ্ঞেস করছি, সূর্যটা কেন পাহাড়ে ঢেকে আছে? সৌমিত্রকাকু বলছেন, পরে বলব বাবা। অন্যরাও দেখি, এড়িয়ে যাচ্ছেন। ভয়ে ভয়ে থাকছেন, কখন কী প্রশ্ন করে বসি। কিন্তু একজন লোক কখনও বিরক্ত হননি,

মানিকজেঠু। ঠান্ডা মাথায় আমার একের পর এক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেলেন। কখনও বিজ্ঞানের সহজ ব্যাখ্যা দিয়ে, আবার কখনও ইতিহাস থেকে নানা গল্প টেনে এনে সহজভাবে আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। এখন যখন ভাবি, অবাক হয়ে যাই। এত বড় মাপের মানুষ এত সহজে মিশতে পারেন! যাঁরা বাইরে থেকে মানিকজেঠুকে গম্ভীর ভাবেন, তাঁরা তাঁকে কতটা ভুল জানেন, সেটাই মাঝে মাঝে ভাবি!

৬ মাস পর কান্না

আমরা জয়সলমির থেকে ফিরে গেছি। ছ মাস পেরিয়ে গেছে। কলকাতায় তখন ফাইনাল এডিটিং চলছে। হঠাৎ মানিকজেঠুর মনে হল, একটা কান্নার দৃশ্য ঢোকালে ভাল হয়। সোনার কেল্লায় দাঁড়িয়ে মুকুল কাঁদছে। সেই কান্না আস্তে আস্তে হাসিতে বদলে যাবে। হাসির দৃশ্যটা ওখানে শুট করা হয়েছিল। কিন্তু তার আগে একটা কান্নার দৃশ্য জরুরি ছিল। মানিকজেঠু ডেকে পাঠালেন। আমাকে বললেন, একটা কান্নার দৃশ্য ঢোকাতে হবে। জানতে চাইলেন, আমি পারব কিনা। কিন্তু কলকাতায় সোনার কেল্লা কোথায় পাওয়া যাবে? মানিকজেঠু বললেন, তুমি যদি কাঁদতে পারো, আমি এখানে নতুন করে সেট তৈরি করব। কুড়ি হাজার টাকা খরচ। তুমি কাঁদতে পারলে তবেই কুড়ি হাজার টাকার নকল সেট তৈরি করব।' কুড়ি হাজার টাকা মানে ঠিক কতটা, তখন বুঝিনি। তবে আমার জন্য কলকাতায় নকল সেট তৈরি হবে! এটা ভাবতেই আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল। নকল সেট তৈরি হল। ছমাস পর সেই কান্নার দৃশ্য শুট করা হল। যদি খুব খুঁটিয়ে দেখেন, তাহলে কান্না আর হাসির দৃশ্যের তফাতটা বুঝতে পারবেন। কারণ, কান্নার দৃশ্যে আমার নতুন দাঁত বেরিয়েছে। আজ থেকে ৪৬ বছর আগে কুড়ি হাজার টাকা মানে বেশ বড়সড় অঙ্ক। শুধুমাত্র একটা কান্নার দৃশ্য নেবেন বলে তিনি কলকাতায় একটা নকল সোনার কেল্লা বানিয়েছিলেন, তাও আবার এক শিশু শিল্পীর জন্য! কতখানি পারফেকশনিস্ট হলে এমনটা করা যায়!

মাস্টার নয়

সিনেমায় ছোটদের অভিনয় নতুন কিছু নয়। আমার থেকেও কম বয়সে অনেকে অভিয় করেছে। সেই শিশুকে কেন্দ্রীয় চরিত্র করেও ছবি তৈরি হয়েছে। কিন্তু সবক্ষেত্রেই দেখেছি, সেই শিশুশিল্পীর নামের আগে 'মাস্টার' কথাটা

লেখা থাকে। আমার ক্ষেত্রে কিন্তু টাইটেল কার্ডে ‘মাস্টার কুশল’ লেখা ছিল না। লেখা হয়েছিল পুরো নাম—কুশল চক্রবর্তী। ব্যাপারটা আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে মামুলি একটা ব্যাপার। কিন্তু এই ছোট্ট ঘটনা থেকে বোঝা যায়, একজন শিশু শিল্পীকে তিনি কতখানি মর্যাদা দিতেন। অন্য পরিচালকদের মতো তিনি ‘মাস্টার’ প্রথায় বিশ্বাস করেননি। তাই আমার গায়ে কখনও ‘মাস্টার’ তকমাটা লাগেনি।

তাঁর চিঠিতেই স্কুলে

সোনার কেল্লা মুক্তি পেল

শুক্রবার। শনিবার থেকে আমি যেন সেলিব্রিটি। কত লোক এসে নিজে থেকে কথা বলছে। কেউ হাত মেলাচ্ছে, কেউ সই চাইছে। কেউ গাল টিপে দিচ্ছে। অনেকে জানতে চাইছে, কোন স্কুলে পড়ি। আমি উত্তর দিচ্ছি, পড়ি না। কারণ, সত্যিই আমি তখনও পর্যন্ত কোনও স্কুলে ভর্তিই হইনি। লোকে ভাবল, ছেলেটা আগে বোধ হয় স্কুলে যেত। ফিল্মে নেমে বখে গেছে। পড়াশোনা শিকেয় উঠেছে। আমার এসব অভিজ্ঞতার কথা বাবা একদিন মানিকজেঠুকে বললেন। মানিকজেঠু পাঠভবন স্কুলে একটা চিঠি লিখে দিলেন। ভর্তি হয়ে গেলাম। হ্যাঁ, আমার স্কুলে ভর্তির পেছনেও মানিকজেঠু।

চাকরি ছেড়ে অভিনয়ে

একে একে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকের গন্ডি পেরোলাম। আর কোনও ছবিতে অভিনয় করিনি। বা, অভিনয়কে পেশা করার কথাও ভাবিনি। জয়েন্ট এন্ট্রান্সে সুযোগ পেয়ে ভর্তি হলাম যাদবপুর

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। পাঁচ বছর পর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারও হয়ে গেলাম। পাস করতে না করতেই চাকরিও পেয়ে গেলাম। চাকরি নিয়ে চলে গেলাম গুজরাটে। দিব্যি চাকরি করছিলাম। কিন্তু কেন জানি না, ঠিক তৃপ্তি পাচ্ছিলাম না। মনে হচ্ছিল, কলকাতায় ফিরে যাই। ফিরে এলাম। শুধু ফিরে আসা নয়, মাথার মধ্যে আবার অভিনয়ের পোকাটা নড়ে গেল। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘সেই সময়’ উপন্যাসকে নিয়ে জোছন দস্তিদার একটা মেগা ধারাবাহিক করতে চাইলেন। গঙ্গা-র চরিত্রে সুযোগ পেলাম আমি। ফিরে আসার পর ওটাই আমার টার্নিং পয়েন্ট। আর পেছন ফিরে নয়। একেবারে পুরোপুরি জড়িয়ে গেলাম অভিনয়ের সঙ্গে।

এই তো কালকের ঘটনা!

সোনার কেল্লার মুকুল নাকি জাতিস্মর ছিল। আগের জন্মের কথা তার মনে পড়ে যেত। আমার পূর্বজন্ম আমি জানি না। কিন্তু বারবার সোনার কেল্লার কথা মনে পড়ে যায়। এত বছর আগের কথা। আমার বয়স তখন মাত্র ছয়। ভুলে যাওয়ারই কথা। হয়ত ভুলেও যেতাম। কিন্তু নানা জায়গায় এতবার আমাকে ‘সোনার

কেল্লা’র গল্প বলতে হয়েছে, মনে হয়, এই তো কালকের ঘটনা। যতদিন বাঁচব, আরও কতবার যে বলতে হবে! বিশ্বাস করুন, একটুও বিরক্তি আসে না। মনে মনে আমিও যে ফিরে যাই ওই সোনার কেল্লায়।

বেঙ্গল টাইমস

২ মে, ২০২৫

সত্যজিৎ স্পেশ্যাল

ISSN 2445 5657 | bengaltimes.in